পঞ্চম অধ্যায়

নাটককার বাদল সরকার

বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন 'নাটক লেখা, পরিচালনা করা আর অভিনয় করা এইটে হচ্ছে আমার সত্যিকারের পরিচয়।"[১] অর্থাৎ শুধু অভিনয় নয়, বাদল সরকার নিজের নাট্যদলের জন্য নিয়মিত নাটক রচনাও করে গেছেন। প্রসেনিয়াম আর অঙ্গন-মুক্তমঞ্চ মিলিয়ে ৫০-এর বেশি ছোট-বড় নাটক লিখেছেন। বাংলা থিয়েটারে সাধারণত দেখা যায় থিয়েটারের প্রয়োগের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরাই নাটক লিখে থাকেন। যিনি নাটক লিখবেন তিনি নাটকের প্রয়োগকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, এই ধারা গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই হয়ে আসছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একেবারে সক্রিয় ভাবে অভিনয়— পরিচালনার মধ্যে নেই অথচ নাটক লিখেছেন এরকম দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে আমরা মধুসূদন দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালকে পেয়েছিলাম। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। যিনি থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থেকেও নিয়মিত নাটক লিখেছেন। আসলে বেশিরভাগ নাট্যদল নিজেদের নাট্যাভিনয়ের তাগিদে নাটক তৈরি করে থাকেন। উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই নিজের দল তথা প্রোডাকশনের প্রয়োজনে নাটক তৈরি করে নিয়েছেন। এঁদের মত বাদল সরকারও তাঁর নাট্যদল 'শতাব্দী'-র প্রয়োজনে নিয়মিত নাটক রচনা করেছেন। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার জীবন শুরু করেন অভিনয় দিয়ে। তারপর পরিচালনা এবং সেই পরিচালনার বা প্রযোজনার জন্য যখন নাটক প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন নাটক লেখা আরম্ভ করলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''প্রথম আমি শুরু করি অভিনয় করতে। তারপর একটু একটু করে পরিচালনা এবং শেষ পর্যন্ত আমি যে সব নাটকে অভিনয় করতে চাই তার অভাব দেখে নাটক লেখার চেষ্টা করা। সব শেষে এটা এসেছে। এমনকি কোনোদিনও নিছক সাহিত্য রচনার মত করে নাটক লিখে যাচ্ছি, অভিনয় করবে অন্যলোকে, এ অবস্থায় আমি যাইনি। নাটক করাটাই আমার নাটক লেখার প্রধান ইনসেনটিভ।"[২]

অর্থাৎ বাদল সরকার নিজেকে একজন নাটককার রূপে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। বাদল সরকার নিজে যতই বলুন না কেন বাংলা তথা সারা দেশ জুড়ে তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা কিন্তু একজন নাটককার হিসেবে। এই অধ্যায়ে তাঁর নাটকের আলোচনা সূত্রে নাটককার বাদল সরকারের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। একজন নাটককাররূপে বাদল সরকার কতখানি সফল, শিল্পমূল্যের বিচারে তাঁর

নাটকগুলি কতখানি উৎকৃষ্ট এই অধ্যায়ে সেই দিকটি আলোচনা করা হবে।

বাদল সরকারের লিখিত নাটকের সংখ্যা সাতান্ন। এর মধ্যে বাইশটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য আর বাকি সবকটি নাটক লিখেছেন অঙ্গন মঞ্চ ও মুক্তমঞ্চের কথা মাথায় রেখে। যদিও এই মঞ্চ বিভাজন থাকা সত্ত্বেও নাটকগুলির এদিক সেদিক হয়েছে, কয়েকটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের নাটক প্রযোজিত হয়েছে মুক্তমঞ্চে আর কয়েকটি নাটক স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে অঙ্গন থেকে বাঁধা মঞ্চে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেও আমরা নাটককার বাদল সরকারের লিখিত নাটকগুলি দুটি পর্বে বিভাজন করতে পারি। প্রথম পর্ব তাঁর প্রসেনিয়াম থিয়েটার তথা বাঁধা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত নাটক, আর দ্বিতীয় পর্ব হল, অঙ্গন মঞ্চ-মুক্তমঞ্চের নাটক অর্থাৎ তৃতীয় ধারার থিয়েটারের নাটক।

১.

বাদল সরকারের প্রথম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে বেশ কিছু নাটক কৌতুক রসের, আর কিছু নাটক সিরিয়াসধর্মী। যেখানে হাসি বা কমেডির পরিবর্তে সমাজ, রাষ্ট্র এবং মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাই মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে তাঁর নাটক রচনার প্রথম পর্বকে দুটি অনুপর্বে বিন্যস্ত করে আমরা আলোচনা করতে পারি। তাঁর প্রথম নাটক 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬) থেকে 'কবি কাহিনী' (১৯৬৪) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি মোটামুটি বিষয়গত দিক থেকে এক গোত্রের। আর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩) থেকে 'শেষ নেই' (১৯৭০) পর্যন্ত নাটকগুলি একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং বিষয় বিন্যাসের আবেদনগত দিক থেকে স্বতন্ত্র গোত্রের। আমরা শুরুতে তাঁর কৌতুক নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এক.

বাদল সরকার তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে যেভাবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত ধারাকে মেনে নিয়ে থিয়েটার জীবন শুরু করেছেন, নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। সাধারণ নাটকের মতোই অঙ্ক কিংবা দৃশ্য, বিশিষ্ট ঘটনাধর্মী কাহিনির উত্থান-পতন এবং 'মধুরেণ সমাপেয়ৎ' নাটকই ছিল আদর্শ। এই পর্বের নাটকগুলিতে হাস্যরসকে মূল রস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হাস্যকর কিছু পরিস্থিতি নির্মাণ করে দর্শককে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। আমরা নাটকগুলি আলোচনার পূর্বে দেখতে চেষ্টা করব কেন হাস্যরসকে নাটক রচনার মূল আধার হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন। কেন তিনি এই পর্বের নাটকগুলিতে হাস্যরসকে মূল রস হিসেবে গড়ে তুললেন এবং ওই হাস্যরস নির্মাণের জন্য নাট্য পরিস্থিতি গড়লেন।

ছোটবেলা থেকেই বাদল সরকারের কমেডির প্রতি একটা আলাদা ঝোঁক ছিল। ছাত্রাবস্থায় থেকেই তিনি হাস্যরসের নাটক পড়তে ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন—

> ''অন্য বইয়ের থেকে নাটক পড়তে বেশি ভালো লাগত। দ্বিজেন রায়ের 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবারপতন', গিরিশ ঘোষের 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'আবু হোসেন', 'ক্ষীরোপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' ইত্যাদি কতবার যে পড়েছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ কয়েকটি চরিত্র মনে বেশি জায়গা করে নিয়েছিল তখনই— দিলদার, হামিদ সর্দার, কঞ্চুকী, বিদূষক, ঘেসেরা-ঘেসেটি, আবু হোসেন। মূল সুরটা হাসির।''[৩]

এই ভালো লাগার জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পর ধারাবাহিক লেখার দিকে যখন তিনি ঝুঁকলেন তখন প্রথমত হাসির নাটককেই বেছে নিলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ''সেই সময়ে আমার একটা ঝোঁক ছিল কমেডির উপর। এবং যে-কটা কমেডি করার মতো মনে হয়েছে, সব করা হয়ে গেছে। তার সবগুলো যে পুরোটা ভালো লেগেছে তাও নয়, তবু করেছি। আসলে বাংলায় তো স্ট্রেট কমেডি তেমন ছিল না— মানে প্রহসন নয়, স্যাটায়ার নয় ... তখন একটা লেখবার ঝোঁক আসে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে নাটক করতে চাই।''[৪]

উনিশ শতকে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা কমেডি নাটক লেখার প্রচলন হয়। মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, ব্রাহ্মধর্মের উত্থান প্রভৃতির ফলে এতদিনের প্রচলিত বাঙলার সমাজ জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তার সবটাই যে পরিত্যাজ্য এ কথা বলা যায় না, তেমনি অনেক কিছুই তৎকালীন নাটককাররা মেনে নিতে পারেননি। সমাজে প্রচলিত অনেক কুপ্রথা-কুসংস্কার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই সময়ের নাটককাররা বারবার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। নানা ভণ্ডামি, মদ্যপান, লাম্পট্য প্রভৃতি থেকে সমাজকে কলুষমুক্ত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের কমেডি নাটকগুলির ভূমিকা, শিরোনাম, বিশেষ বিশেষ চরিত্রের নাম, সংলাপ বিশেষত যে চরিত্রগুলি নাটককারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে সম্যকভাবে নাটককারদের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হতো। যেমন— রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট', 'বাবু' প্রভৃতি। এইসব কমেডি রচয়িতাদের নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। সমাজের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও

যৌন জীবনের যে অনাচারগুলি তাঁদের পীড়িত করত সেগুলির উপর তাঁদের ব্যাঙ্গের তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল কমেডিকারই যে সামাজিক অসংগতির চিত্র অঙ্কণ করে গেছেন তা নয়। শুধুমাত্র সমাজ সংশোধনে বা রুচিবিকৃত মানুষের চাহিদাবৃত্তি, চরিত্র সংশোধনের জন্যই প্রহসন রচিত হতে পারে না, নিছক নির্মল আনন্দদানের উদ্দেশ্যও কমেডি রচনা করা যায় তার প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যকৌতুক নাটক। আর সেই ধারাকে আরো প্রসারিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুক নাটকের মধ্যে। সমাজের উপর তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিবর্তে মানুষের অন্তর্লোকে আলো ফেলে তাদের চিন্তাভাবনার শিথিলতা, চরিত্রের দুর্বলতা, জীবনাচরণের অসঙ্গতি প্রভৃতি মার্জিত কৌতুকে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের কমেডি নাটকে। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলি আশ্রমজীবনে সাময়িক বৈচিত্র্য আনার জন্য ও বালক বালিকাদের আমোদ-প্রমোদ দেবার জন্য রচিত। যেমন— 'পেটে ও পিঠে', 'ভাব ও অভাব', 'আর্য ও অনার্য', 'গুরুবাক্য', 'সূক্ষ্ম বিচার' প্রভৃতি। সামগ্রিক বিচারে তাঁর কৌতুকপ্রধান নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্যক্তি চরিত্রের অসংগঠিত, যেমন— বাতিক গ্রস্ততা, মুদ্রাদোষ, অতি সারল্য, অত্যাধিক চিন্তা করার প্রবণতা, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে তিনি মূলত কৌতুক বা পরিহাস করেছেন, কিন্তু সেখানে সমাজের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রকাশিত হয়নি। নিছক কৌতুক বা ব্যাঙ্গের ছলেই সমাজের অনাচার বা কোন অনড় অবস্থানের বিরুদ্ধে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নির্মল কৌতুক নাটকের ধারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আসলে বাঙালি হাসির প্রসন্নতার তুলনায় পছন্দ করে বিক্রমের তীর্যকতা। অনেক বাঙালি অতিরিক্ত গোমড়ামুখো, তার্কিক, তাত্ত্বিক এবং বেরসিক, সবকিছুতেই গভীর অর্থ খোঁজা স্বভাব এবং দেশের ও দশের উপকার না হলে শিল্পসৃষ্টিমাত্র নিষ্ফল বলেই মনে করেন। তাই জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র অনুসৃত কমেডির ঐতিহ্য আমাদের তেমন গড়েনি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' অথবা অনুরূপ নাট্যকীর্তি বাংলায় প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। অথচ সার্থক স্যাটায়ারদের সংখ্যা সেকালে অথবা একালে একেবারে উপেক্ষার মতো নয়। তুলনায় প্রসন্ন কমেডি বাংলায় নিতান্তই অপ্রতুল। বাদল সরকার যেন এই অভাব মেটানোর জন্যই লিখতে শুরু করেছিলেন হাসির নাটক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> ''আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছা করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে— আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি।

তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়।”[৫]

হিউমারহীন নাটক বা হাসি নেই এমন নাটক বাদল সরকার খুব একটা পছন্দ করতেন না। যদিও বাদল সরকার পরবর্তী জীবনে বেশ কিছু সিরিয়াস নাটক লিখেছেন কিন্তু হাসির নাটকের প্রতি তাঁর একটা অন্যরকম দুর্বলতা ছিল। তাঁর মতে হাসির নাটক লেখা সবচেয়ে কঠিন কাজ। একটি সাক্ষাৎকারে তাই বাদল সরকার লিখেছেন—

> ‘‘হিউমার নেই, হাসি নেই এমন নাটক, আমার না ডাইরেকশান দিতে ইচ্ছে করে, না লিখতে ইচ্ছে করে। আর ওই ধরনের নাটক লেখাটা এত শক্ত যে ওটা আর বুড়ো বয়সে আমার ক্ষমতায় কুলোবে বলে মনে হয় না। ফলে সোজা কথা নাটক লেখায় ছেড়ে দিলাম।”[৬]

বাদল সরকারের এই বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কমেডি তথা হাসির নাটক লিখতে তিনি কতটা পছন্দ করতেন। এবং তিনি এও জানাচ্ছেন যে হাসির নাটক লিখতে পারছেন না বলে তিনি নাটক লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন! বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার জীবনের প্রারম্ভে, ছোটখাটো নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যখন একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করছেন তখন তিনি হাসির নাটককেই অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাদল সরকার কিন্তু নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ, মুখবিকৃতির সাহায্য নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করার কৌশল পছন্দ করতেন না। ‘নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে’[৭] হাসাতে তিনি ভালোবাসেন। নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতি বাংলা হাসির নাটকের মূল আলম্বন কিনা সে বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু বাদল সরকারের হাসির আলম্বন যে এসব নয় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ‘সলিউশন এক্স’ থেকে ‘কবিকাহিনী’ পর্যন্ত রচিত নাটকগুলিতে। সমস্যার অনন্যতায় নয় চরিত্রগুলোর জটিলতায় নয়, এই নাটকগুলি পাঠকের মন দ্রুত অধিকার করে নেয় পরিস্থিতি নির্মাণের নিপুণ চাতুর্য ও সংলাপের অমোঘ প্রয়োগের অনিবার্যতায়। শিল্পের অন্যতম শর্ত হল সংযম। বাদল সরকার সেই সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরিমিতবোধ দিয়েই তিনি সংহার করেন যাবতীয় ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সম্ভাবনাকে। তিনি কমেডি নাটকে সমাজের প্রতি কোন বক্তব্য কিংবা যুগ সমস্যার আলোচনা অথবা বাণী পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল শুধু ‘হাসি বা হাসানো’।[৮] বাদল সরকারের হাসির নাটকগুলি পড়লে মনে হয় তিনি নিজে এই ধরনের নাটক অত্যন্ত উপভোগ করেছেন এবং সেই উপভোগের অংশটা পুরোপুরি পাঠককে-দর্শককে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। হাসির নাটক হিসেবে এই পর্বের নাটকগুলির মূল্য পাঠক-দর্শকের কাছে আর যাই হোক না কেন, বৃহত্তর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বাদল সরকারের এই নাটকগুলিই ছিল অনিবার্য প্রথম অবলম্বন। এই

নাটকগুলিকে সম্বল করেই বাদল সরকার ক্রমশ নাটকের জগতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছেন আর সেই সঙ্গে একদিকে বিনোদন এবং অন্যদিকে দায়বদ্ধতার প্রস্তুতি নিয়েছেন এই পর্বে। সুতরাং নাট্যকর্মী বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকগুলির প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমরা প্রথমে তাঁর হাসির নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাদল সরকারের প্রথম নাটক **'সলিউশন এক্স'**, ১৯৫৬-এ লেখা। যদিও এর আগেও তিনি নাটক রচনা করেছেন। নাট্যরূপও দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী এটি-ই তাঁর লেখা প্রথম নাটক। নাটকটি একটি বিদেশী চলচ্চিত্র 'মাঙ্কি বিজনেস' (Monkey Business)-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে সাপ্তাহিক 'খাপছাড়া' পত্রিকায়। এই নাটকটি সম্পর্কে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''...১৯৫৬ সালে বিলেত যাবার আগে 'মাঙ্কি বিজনেস' বলে একটা সিনেমা দেখেছিলাম, তার থেকে গল্পের একটা আইডিয়া পেলাম। সেই আইডিয়াটা নিয়ে আমি *'সলিউশন এক্স'* লিখেছিলাম। ... ওটাই আমার প্রথম নাটক।''[৯]

একটি সলিউশনকে নিয়ে যে কীর্তি এবং বিভ্রাট তা এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু। শম্ভুনাথ বিজ্ঞানী ভোলামনের মানুষ। তার গবেষণাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিভ্রাট ঘটে গেছে। মূলত বিভ্রান্তি থেকেই এই বিভ্রাট। বার্ধক্য ঠেকবার ঔষধ বের করতে গিয়ে খরগোশের উপর পরীক্ষা করার জন্য একটা সলিউশন ব্যবহার করতে বলে এসেছেন সহকারী সোমেন চ্যাটার্জিকে। ফোনে খবর নিচ্ছেন শম্ভুনাথ। এই ফোনে খবর নেওয়াটা দারুণ উপভোগ্য এবং কৌতুকময়—

> ''... ইয়ে— সোমেন চ্যাটার্জী তো? ... মানে, ডক্টর সোমেন চ্যাটার্জী তো? ... যাক, ঠিক আছে তাহলে— বাঁচা গেল— কী হোলো বলুন তো? হ্যাঁ... হ্যাঁ... আর কিছু না? ... আচ্ছা, ঝটফট কতোক্ষণ করেছে ...? ছটফট নয়? লাফালাফি? ... দু' মিনিট তেরো সেকেন্ড? কী রকম ধরনের? ... দু'পায়ে দাঁড়িয়েছিলো? ক'বার ... তিনবার? ... আচ্ছা শুনুন, আপনি ফিল্‌টার্ড সলিউশনটা একটু আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবেন? না না, পাঠিয়ে নয়, আপনি নিজে যদি আসতে পারেন— আর কাউকে বিশ্বাস নেই। ... আসছেন? থ্যাঙ্কস্।''[১০]

এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা। গবেষণাগার থেকে ঐ সলিউশনটা বাড়িতে এনেই বিপত্তিটা ঘটল। ঐ সলিউশনে মেশানো হয় গ্ল্যাণ্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোর। আর সেই মিশ্রিত সলিউশন পড়ে গিয়ে মেয়ে টুটুলের হাতে। ধরা পড়ার ভয়ে টুটুল সেটা জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়। কেউ জানতে পারল না। সেই জল যারা খেলেন তারা প্রত্যেকে সলিউশন-এর প্রভাবে একটু আধটু

আক্রান্ত হলেন। এলোমেলো কথা বলতে বা অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে দিলেন। ডাক্তার শম্ভুনাথ ঐ মিশ্রিত সলিউশন খেয়ে ছাদে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরই ফাঁকে পাশের বাড়ির একটি বাচ্চা ছেলে সকলের অলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাথটবের কাছে খেলা করছিল। শম্ভুনাথকে খুঁজতে গিয়ে বাথরুমে তার ট্রাউজার্স দেখে এবং একপাশে শিশুটিকে দেখে শম্ভু-পত্নী অণিমা প্রায় পাগল হতে যায়। শম্ভু-পত্নী অণিমার মনে হয়, ঔষধের প্রয়োগে তার স্বামী শিশু হয়ে গেছে। অণিমা ভাবল এই শম্ভু।

> ''অণিমা: দেখেছেন সোমেনবাবু? ঠিক সেই নাক, সেই মুখ— শুধু গোঁপটা নেই। ওগো শুনছো? তুমি একটু কথা বলতে চেষ্টা করো না? আমার কথা বুঝতে পারছো না ...ঐ দেখুন! আপনি ডাকতেই আপনার দিকে ফিরেছেন। নাম মনে আছে নিশ্চয়ই!''[১১]

শম্ভুনাথ ঘুম সেরে ছাদ থেকে নেমে আসে। তিনি বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তিত কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে কি ঘটছে। বাড়িময় হৈ হৈ পড়ে গেছে। শেষে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়।

সহজ সরল কাহিনি। কোন গভীর বক্তব্য নেই। নেই কোন সমাজের প্রতি বার্তা। এক রহস্য নাটকের পরিবেশ তৈরি হলো বটে তবে তা শুধু অভিনয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের জন্য। সবটাই ঘটেছে দর্শকের চোখের সামনে। তাদের চোখের সামনেই টুটুল জলের ট্যাংকের মধ্যে সলিউশন বিকারটা ফেলেছিল। ফলে দর্শকের সবটাই জানা। অভিনেতারা যথেষ্ট উত্তেজিত অথচ দর্শক সানন্দে রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। নাটকে যথেষ্ট টেনশন তবে কোথাও কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই। এখানে বিজ্ঞানের গবেষণাকে কোনভাবে ব্যঙ্গ না করেই একটা অসাধারণ হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিস্থিতি বা কমিক সিচ্যুয়েশন নির্মাণে বাদল সরকার এখানে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নিজে নির্দেশক ও অভিনেতা হওয়ার কারণে বাদল সরকার অভিনয়ের ব্যাপারে খুব সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমিত ক্ষমতার কথা তিনি জানতেন। ফলে কম খরচায় কী করে মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায় তার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। নাটকের একটি দৃশ্য। মধ্যবিত্ত ডাক্তারের বাড়ি। নাটকের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে কোথায় কী রাখা আছে—

> ''বৈজ্ঞানিক ডক্টর শম্ভুনাথ সেনগুপ্তের বাড়ি। ঘরটি তাঁহার নিজস্ব গবেষণাগার। মঞ্চের পিছন দিকে একটি বড়ো টেবিলে গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, রসায়ন পদার্থ ইত্যাদি রহিয়াছে। নিকটে খান দুই টুল। সম্মুখের দিকে একপাশে একটি লিখিবার টেবিল ও চেয়ার, অন্যপাশে একটি বড়ো গদিসমন্বিত চেয়ার। পিছনে

বড়ো টেবিলটির নিকটে একটি টুলের উপর একটি মাঝারি আকারের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, উপরে ঢাকনা ও সামনে ছোট একটি কল— যেমন সচরাচর থাকে। কলের নিচে একটি বালতি অথবা অনুরূপ পাত্র। লিখিবার টেবিলে টেলিফোন। ঘরের একদিকে বাহিরে যাইবার পথ, অন্যদিকে অন্দরের।"[১২]

অভিনয়ের সময় কী কী লাগবে, সব উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বাদল সরকার নির্দেশকের কল্পনা বা ইচ্ছের উপর নির্ভর না করে সবকিছুই বলে দিয়েছেন নাটকের মধ্যেই।

নাটকের ঘটনাগুলি এক রাতের মধ্যে ঘটে। দ্রুত গতিতে নাটক এগিয়ে চলে, কোথাও এক মুহূর্তের জন্য থামবার ফুসরত নেই। নিশ্চিত রূপে এ নাটক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা। এ নাটকে দর্শকের কোন রকমের সহযোগিতা দরকার নেই। তারা আসুন, টিকিট কাটুন, আরামে বসে নাটক দেখুন, উপভোগ করুন, হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যান। এইরকম স্ট্রেট কমেডির অভাবই এতদিন বাদল সরকার অনুভব করেছিলেন। 'সলিউশন এক্স' এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সেই অভাব পূরণে সার্থক ভূমিকা পালন করেছে।

বাদল সরকারের দ্বিতীয় এবং পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক '**বড়ো পিসীমা**'। 'বড়ো পিসীমা' কমেডি নাটক হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এটি হিন্দিতে 'বড়ি বুয়াজি' নামে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রবাল। 'বড়ো পিসীমা' নাটকের রচনাকাল নিয়ে একটু বিভ্রান্ত হতে হয়। 'রঙ্গনাট্য সংকলন'-এ 'বড়ো পিসীমা'র রচনাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে উনিশশো ঊনষাট সালের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু ঐ গ্রন্থের পরের পাতায় ভূমিকা লিপির শেষে পুনরায় রচনাকাল উল্লেখিত হয়েছে ১৯৫৮ সাল। আবার 'নানামুখ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ১৯৫৯। তবে এটি বাদল সরকারের লণ্ডন প্রবাসকালে লেখা। ১৯৫৭-৫৯ পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে ছিলেন। ফিরে এসে 'চক্র' -এর প্রযোজনায় 'বড়ো পিসীমা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বাদল সরকারের নির্দেশনায় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সালে এ.বি.টি.এ-এর হল ঘরে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকার এই নাটক সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

"বিলেতে প্রথম ফুল লেংথ মৌলিক নাটক লিখেছি *'বড় পিসীমা'*। মাইথনে থিয়েটার করতে গিয়ে যে ঝামেলাগুলো হত সেটাকেই ভিত্তি করে লেখা।"[১৩]

নাটকে আছে বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়ের বয়সী মেয়েদের নাটকে অভিনয় করা নিয়ে কি হাঙ্গামা না হত— তারই চিত্রণ। কলকাতার একটি কলোনিতে সবাই মিলে একটি নাটক করবার উদ্যোগ নিয়েছেন। 'কালবৈশাখী' নামে একটি নাটকের রিহার্সাল চলছে অন্যতম অভিনেত্রী অনুর ফ্ল্যাটে। সেখানে নাট্য পিয়াসী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জড়ো হয়েছেন। নাটকের রিহার্সাল চলছে। শুরুতেই বাদল সরকার এমনভাবে ঘটনা এবং তার উপযোগী সংলাপ রচনা করেছেন যে

নাটক সেখান থেকেই জমে ওঠে। বিপদগ্রস্ত নায়িকা যখন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মথিত, ঠিক তখনই নাটকের মহড়ার বাইরে বাড়ির ভেতর থেকে ভৃত্য নায়িকা অনুকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে, ডাক দর্শকেরা শুনতে পাচ্ছেন— ''দিদিমণি! মা ডাকছেন, আপনাকে খাবেন, আসুন।'[১৪] নায়িকার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মুহূর্তেই এই রকম হাস্যকর একটি ভুল নাটকীয় সংলাপে মহড়া কক্ষে হাসির রোল ওঠে। কারণটা পরিচালকের কথায় স্পষ্ট, 'পরশু থিয়েটার-মধ্যে আর একটা দিন! আজও মাকে মেয়ে খাওয়াচ্ছো? সেদিন একমাঠ লোকের সামনে কী কেচ্ছাটি হবে একবার ভেবে দেখেছো?''[১৫] অর্থাৎ নাটকের ভিতর নাটক। প্রথমেই নাটকীতা। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের পর উচ্চকিত হাসিতে পরিচালকের কথায় বোঝা গেল সেটা মহড়া। প্রথমে তা বলা হচ্ছে না। প্রথমেই হাস্যকর সিচুয়েশন পাচ্ছি। এই সিচুয়েশনটি আরও ঘনীভূত হয় পরিচালকের অত্যন্ত সিরিয়াস হওয়ার ফলে। বিরক্ত পরিচালক আবার ফিরে সেই সিনটি মহড়ায় ফেলতে চাইছেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হয়ে সিনটি আবার করতে বলেন। এদিকে নায়িকা পড়েছে বড় বিপদে। এই সিনটি আবার করতে হলে তাকে তো আবার ডুকরে কাঁদতে হয়। বিরক্ত হয়ে নায়িকা বলে—

> ''আর আমি কাঁদতে পারবো না! কতোবার কাঁদা যায় বলুন? সবশুদ্ধু চারটে সীনে ছ'টা কান্না। শেষ দৃশ্যে তো প্রায় একনাগাড়ে কেঁদে যাওয়া। ভালো বই বের করেছেন বেছে— 'কালবৈশাখী' ''।[১৬]

আমরা বুঝতে পারি যে নাটকের মহড়া চলছে সেই নাটকের নাম 'কালবৈশাখী'। 'কালবৈশাখী' নামটা তাৎপর্যবহ। নাটকের রিহার্সাল চলাকালীন হঠাৎ খবর এলো অনুর ফ্ল্যাটে তার বড় পিসিমা আসছেন। বড় পিসিমা প্রাচীনপন্থী এবং ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মহিলা। বাড়িতে মেয়ে থাকবে হইহল্লা হবে, এ সমস্ত একদমই পছন্দ করেন না। থিয়েটার তো নয়ই, অথচ নাটকের রিয়ার্সাল চলছে অনুদের ফ্ল্যাটে। সেটাই প্রকৃতপক্ষে নাট্যমঞ্চ। এদিকে অনাথ স্টেজ ও প্যাণ্ডেল বাঁধার নারকেল দড়ি রাখতে এসেছে, শম্ভু বাঁশ পোতা শেষ করেছে, সকলে প্রবল উৎসাহে নাটকের মহড়া দিচ্ছে। এমন সময় কালবৈশাখী ঝড়ের মত এলেন বড় পিসিমা। বাইরে পিসিমার 'যোগীন' 'যোগীন' ডাক শুনে হঠাৎ করে সকলেই ঘাবড়ে যায়। যোগীন অনুর বাবা। বড় পিসীমার ভাই। অনু ঘাবড়ে গিয়ে বলে 'বড়োপিসী! শিগ্‌গির!!'[১৭] অর্থাৎ বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। নাটকীয় সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাটককার লিখেছেন— ''শিগ্‌গির যে কী করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা স্পষ্ট না থাকা সত্ত্বেও ঘরে প্রচণ্ড ব্যস্ততা শুরু হইয়া গেল।''[১৮] পিসিমার হঠাৎ আগমনের কারণে এরপর যা যা ঘটলো তাতে দর্শক না হেসে পারেন না।

> ''স্মারক উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততায় একটি মোড়া সরাইতে গিয়া বারান্দার দরজাটি সম্মুখে

পাইয়া মোড়া ফেলিয়া পলায়ন করিল। পিছনে ধ্রুবেশ। শম্ভু একমাত্র শান্ত, সে নারিকেল দড়ির কুণ্ডলীটি ডিভানের নিচে ঢুকাইল। তারপর চাপাস্বরে 'অ্যাশট্রে'! হাঁকিয়া পিছনের দরজা ভেজাইয়া দিতে গেল।... পিসীমা ... দুইবার সমস্ত ঘরে সমস্ত অতিথিবৃন্দের উপর সার্চ্‌লাইটের দৃষ্টি ঘুরাইলেন।"[১৯]

এরপর সবাইকে পিসিমা নামক উকিলের জেরার মুখোমুখি হতে হয়। কোন কথা না বলে অনু কেবল জানায় যে তার বাবা এদের চা'য়ের নেমন্তন্ন করেছে। পিসিমার হুকুমে সকলে বসে পড়ে। মজার ঘটনা ঘটে শশাঙ্ককে নিয়ে। নিরুপায় হয়ে সে একটি ছাইদানের উপর বসে পড়ে। নাম জিজ্ঞেস করায় সকলে নাটকের রিহার্সালের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকে নিজস্ব নাম উচ্চারণ করে। কিন্তু এরই মাঝে খানিক স্বস্তি, জানা গেল পিসিমা এবার তিন দিনের জন্য অন্য এক আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ তার মধ্যে থিয়েটার হয়ে যাবে। পিসিমা রক্তচক্ষুর ভীতিমুক্ত হয়ে এবার সকলে যে সমস্ত আচরণ করতে থাকে তা নিয়েও ঘটতে থাকে বহুতর বিঘ্ন-বিপত্তি। নিতাই মনের আনন্দে ভুলে সিগারেট বের করেও সচেতন হয়ে লুকিয়ে রাখে। শশাঙ্ক ছাইদানের কথা ভুলে গেছে। পিসিমা তারই উপরে বসেছেন। নাটকীয় সেই ঘটনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটককার নির্মাণ করেছেন। ''(পিসীমা বসিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে ছাইদানের উপর, এবং লাফাইয়া উঠিলেন) মা গো! (ছাইদান তুলিয়া) হুঁ! ভদ্রলোক! বসে বসে বিড়ির শ্রাদ্ধ করেছে। তাও মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে বসে! (হাতুড়ি দেখিয়া হাতে তুলিলেন) এঁচোড়ে পাকা ছোকরা যতো সব! (হাতুড়ি হস্তে একটি নৃশংস ভঙ্গী করিলেন এবং বারান্দার দরজা ঠেলিয়া নারিকেল দড়ি হাতে সেই উদ্যত হাতুড়ির সম্মুখে অনাথের প্রবেশ। পিসিমা ভীষণ চমকাইয়া পিছু হঠিলেন।) কে!! (অনাথ ততোধিক চমকাইয়া পিছিু ফিরিল) এই খবরদার! দাঁড়াও!"[২০] বাদল সরকার এখানে খুবই দক্ষতার সঙ্গে নাট্য ঘটনাকে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের রিহার্সালের মধ্যে দিয়ে এবং নাট্য প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে একেরপর এক বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটে চলেছে। অনাথ বড় পিসিমার নানান প্রশ্নের উত্তরে থিয়েটারের কথা মহাউৎসাহে বলে ফেলেছে। এরপর আবার গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শম্ভুর ভাইপো ভাইজি নাচতে নাচতে ক্রমে পিসিমাকে তাদের অনু মাসি কেমন নাটক করে সেই সংলাপ শুনিয়ে গেছে। ফলে পেটের যন্ত্রণা বলেও অনুর রেহাই নেই। কোন্নগরের মধুদার বাড়ি রওনা হয়েছে। নিরুপায় হয়ে মাস্টার ক্রিমিনাল শম্ভু মধুবাবুর মেয়ের নাম করে অসুস্থতার টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়ায় সেখান থেকে পিসিমা, পিসেমশাই ও অনুকে চলে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত নিতাই-এর সঙ্গে অনুর বিয়ের সার্টিফিকেট জাল করার চিন্তা করে অনুকে থিয়েটার করানোর চিন্তা করেছে শম্ভু। তবে তার প্রয়োজন হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ শম্ভু স্ত্রী চরিত্র চিনতে ভুল করেছে,

সে ভেবেছিল নিতাই অনু পরস্পরের প্রতি দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে অনু শম্ভুর প্রতি দুর্বল। সেটি ভালো বোঝেন শম্ভুর বৌদি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব প্রতিমাদেবী নিয়েছেন। কিন্তু তাতে আরো বেশি রহস্যময় ধন্দে পড়েছে শম্ভু ও নিতাই। দু'জনে শলাপরামর্শ করছে আর মধ্যে মধ্যে থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে কেউ নিতাই-এর সঙ্গে কেউ শম্ভুর সঙ্গে কথা বলেছে। এইভাবে বাদল সরকার কথিত 'সারপ্রাইজ্ আর সাস্পেন্স'[২১] এ নাকটের কৌতুককর পরিস্থিতিগুলি নির্মিত হয়ে চলে।

অবশেষে বড় পিসিমা ফিরে এসেছেন। আর শম্ভুর বৌদির বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে শেষ পর্যন্ত পিসিমা শান্ত হয়েছেন। এমনকি নাট্যাভিনয়ের দিন নিজেই একেবারে সামনের সিটে বসে থিয়েটার দেখেছেন। সম্ভবত পিসিমাকে অনুর সঙ্গে শম্ভুর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করেছেন। তবে কোন মন্ত্রবলে শম্ভুর বৌদি এটা সম্ভব করলেন তার কোনো স্পষ্ট রেখাচিত্র নেই। বস্তুত শম্ভুকে পিসিমা প্রথম থেকেই ইঁচড়েপাকা জ্যাঠা ছোকরা বলে অপছন্দ করেছেন। আবার যাদের থিয়েটার নেশা তাদের ভালো মানুষ মনে করেন না। এই পিসিমা কীভাবে শম্ভুর সঙ্গে ভাইঝির বিয়ে দিতে রাজি হলেন তাঁর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। শম্ভুর বৌদি পিসিমাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন যাতে পিসিমা নিজস্ব বিশ্বাস থেকে সরে এলেন সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। আসলে এই ধরনের সিচ্যুয়েশনাল কমেডি নাটকের মধ্যে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার যেমন কার্যকারণ সম্পর্ক সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি নানাবিধ সিচ্যুয়েশন বা প্রেক্ষিত-এরও সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা মেলেনা। অবশ্য একথা ঠিক, এই ধরনের নাটকে সব ঘটনা বা প্রেক্ষিতের সব কিছু যুক্তিযুক্ত হবে তা কেউ দাবীও করে না। আসল কথা হল নাটকের মজাটা। এটা জমলেই এই ধরনের নাটকের সিদ্ধি।

এই নাটকের হাস্যরস পরিস্থিতি জনিত। কোন ক্যারিকেচার বা ভাঁড়ামো নেই আবার ব্যঙ্গের কশাঘাতও নেই। নিছক হাসানোর মূল্য যে নাট্যকারের কাছে কম নয় তা এই নাটক পড়লে বোঝা যায়। নির্মল হাস্যরস ফুটে ওঠে এই নাটকের সংলাপে। এই নাটকের সংলাপ পরিস্থিতির তৈরি একেবারে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। যেমন তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শম্ভু ও নিতাই কীভাবে পিসিমাকে সরানো যাবে সেই চিন্তা করে যখন বিভ্রান্ত ও গলদঘর্ম হয়ে পড়েছে তার মাঝেই স্মারক এসে কোন দিক থেকে প্রম্পট করবে জিজ্ঞেস করায় নিতাই উত্তর দিয়েছে বাঁ দিক থেকে। স্মারক পুনরায় জিজ্ঞেস করেছে— ''অ্যাক্টরদের বাঁদিক না দর্শকদের বাঁ দিক?''[২২]

''নিতাই : (ঝাঁঝিয়া) সব্বাইকার বাঁদিক। বললাম না এখন কাজের কথা হচ্ছে!''[২৩]

সিচ্যুয়েশনাল কমেডির এ এক সার্থক সংলাপ। এমনকি পরিবেশ যেমন তৈরি করা হচ্ছে সংলাপের ভাষাও তেমনি হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের 'কালবৈশাখী' নাটক চলছে। রাজীব তার

অভিনয় করে নিতাইয়ের কাছে সিগারেট চাইছে, বলছে— '' — আমার প্যাকেটটা যে কে মেরে দিলো!''[২৪] অর্থাৎ নাটক একটা হচ্ছে এবং এখানে গ্রিনরুমে বসে ঘরোয়া ভাবে কথা বলছে। পরিস্থিতিই 'মেরে দেওয়া'র মতো ভাষার জন্ম দিয়েছে।

সিচ্যুয়েশনধর্মী কমেডির সংলাপের ভঙ্গি এবং ভাষা যথার্থ শিল্পসার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এই নাটকে। তিন অঙ্কের এই নাটকটির দৃশ্য বিভাজনের একটা ক্রম আছে। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য ভাগ নেই অর্থাৎ একটিই দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে দুই দৃশ্য এবং তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য অর্থাৎ অঙ্ক অনুযায়ী তার দৃশ্য সংখ্যা। নাটকের ঘটনাগুলি এত সাবলীলভাবে এগিয়ে চলে যে দর্শকের এপাশ-ওপাশ করার সুযোগ থাকে না। যদিও দর্শক জানে শেষে সব সমস্যার সমাধান হবে এবং নাটকও হবে। নাটককার যেন সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। তাই কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না এগিয়ে চলছে। পিসিমা যে সশরীরে খুব বেশি সময় মঞ্চে থেকেছেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু দর্শক প্রতি মুহূর্তে তার উপস্থিতি অনুভব করে। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন। সবকিছুই ভেবেচিন্তে সাজানো, কোন কিছু অসুবিধা হলে নাটককার সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আপাতত ভাবে মনে হতে পারে 'বড়ো পিসীমা' নিতান্তই মনোরঞ্জনে ভরা একটি কমেডি নাটক। কিন্তু নাটকটির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় প্রতিদিনের জীবনের এক সামান্য ঘটনা থেকে শুরু করে নাটককার আর এক বৈচিত্র্যময় ছোট জগৎ আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা গুজরাটি ভাষার সুপ্রসিদ্ধ নট-নির্দেশক-নাটককার শিবকুমার জোশী 'বড়ো পিসীমা' নাটকের যে মূল্যায়ন করেছেন তা উল্লেখ করতে পারি—

> ''শ্রী বাদল সরকারের এই প্রহসন প্রথম দৃষ্টিতে এক সামান্য, নির্দোষ এবং মনোরঞ্জনে ভরপুর নাটক মনে হয়। সেরকম ধারণা আমারও হয়েছিল প্রথম দু-একবার পড়ে। কিন্তু রিহার্সাল শুরু হবার পরে, নাটকের এক একটি ভাঁজ খুলতে লাগলো আর সামান্য প্রহসনের জায়গায় নাটক একটি রসে ভরা বিশিষ্ট নাট্যকৃতিরূপে প্রকট হতে লাগল।''[২৫]

এ নাটকে খুব যে বলিষ্ঠ বা অসাধারণ কিছু চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এমন কোন দাবি করা যায় না। বাদল সরকার এখানে সাধারণভাবে লোকেদের নজরে পড়া আর নজর থেকে অগোচরে থাকা দু'রকম মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চিত্র এঁকেছেন মাত্র। তবে একমাত্র শম্ভু চরিত্রটিকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন নাটকটার। ইঞ্জিনিয়ার সে, স্টেজের কাজ তার। নকশা তৈরি করে কাজ করেছে। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বয়ং নাট্যকার, যিনি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার। শম্ভু চরিত্রের মধ্যে স্বয়ং নাট্যকার

বাদল সরকারের ছায়া দেখতে পাই। বাদল সরকার এন্টালিতে থাকাকালীন পূজার সময় সকলকে নিয়ে একটা থিয়েটার করার চিন্তা করেছিলেন। শম্ভুর কথায়—

> ''আমরা সবাই মিলে হল্লা করেছি, স্টেজ বেঁধেছি, পাল খাটিয়েছি, চাঁদা তুলেছি, পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকেছি— এক কথায় দল বেঁধে আনন্দ পেয়েছি, পাচ্ছি, দিতে চাইছি।''[২৬]

এই নাকটের সম্পূর্ণ স্টেজ পরিকল্পনা এন্টালির সেই 'এ' ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটের মতো। এন্টালী পর্বের কথা বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন—

> ''চারদিকে চারখানি তেতলা অট্টালিকা— ব্লক এ, বি, সি আর ডি। মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। প্রতি ব্লকে বেশ কয়েকটা করে ফ্ল্যাট। ঢোকার পথ রাস্তার দিকে, খোলা জায়গাটা পড়ে পেছনে। 'এ' ব্লকের ফ্ল্যাটগুলো বড়, বারান্দাওয়ালা। একতলার বারান্দাটা পড়ে ভিতরের মাঠের দিকে। আমার বাস 'ডি' ব্লকের দোতলায়। আমার 'বড়ো পিসিমা' নাটকের অনুদের ফ্ল্যাটের চেহারাটা 'এ' ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটের মতো, স্টেজ প্যান্ডেল ওই চারটে বাড়ি দিয়ে ঘেরা মাঠে।''[২৭]

'বড়ো পিসীমা' নাটক রচনার মূলে নিঃসন্দেহে এন্টালির বাড়ির পারিবারিক নাটক অভিনয়ের প্রেরণা কাজ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায় তিন অঙ্কের এই পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকটি রসসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে।

বাদল সরকারের দ্বিতীয় মৌলিক নাটক **'শনিবার'**। এই নাটকের রচনাকাল অক্টোবর, ১৯৫৯। গতানুগতিক নাটকের মত এ নাটকে কোন অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার প্রাবল্য এবং বাস্তবের সঙ্গে তার সংঘাত এখানে কতকগুলি সিচুয়েশনে উঠে এসেছে।

এই নাট্যকাহিনিতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। বর্তমানে একমাত্র চাকুরে বড় ছেলে দিব্যেন্দু। সে একটি বেসরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করে। বোন সুনন্দা কলেজে পড়ে। ছোটভাই নবেন্দু ব্যস্ত হকি খেলা নিয়ে। এই নাটকের আরেকটি চরিত্র মা। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মা যেমন হয়। এখানে নিম্ন বা মধ্যবিত্ত বড় কথা নয়, বড় কথা হল এর সিচ্যুয়েশনগুলির হাস্যরস। নাটকের শুরু হয় স্নেহপ্রবণ মায়ের সন্তান স্নেহের মধ্যে দিয়ে। মা একটি গ্লাসে করে খানিকটা দুধ নিয়ে ছেলেকে ডাকছেন সেই দুধ খাওয়ার জন্য। কিন্তু দুধ কেউ খেতে চাইছে না। দুধের গ্লাস হাতে মায়ের এই সংকট নাটকে প্রথমেই হাস্যকর সিচ্যুয়েশন তৈরি হচ্ছে। বাড়ির ছোট ছেলে

নবেন্দু খেলোয়াড় সুলভ মেজাজে হকি স্টিক হাতে বলে— ''দুধ খাবো? ইন্ডিয়া এবার অলিম্পিকে হেরে গেছে খবর রাখো?''[২৮] ইণ্ডিয়ার অলিম্পিকে হারার সঙ্গে দুধ খাওয়া না খাওয়ার সম্পর্ক মা বুঝতে পারেন না। নবেন্দু বলে ''আরে হারলো তো ঐ দুধ খেয়ে! ভুঁড়ি নিয়ে কি হকি খেলা হয়?''[২৯] নব্যেন্দু চলে গেলে এবার মা স্বামীকে ধরেন-যিনি দু'ঘণ্টা আগে ভাত খেয়েছেন এবং ওই সময় কখনও দুধ খান না। ভদ্রলোক যখন খুব মুশকিলে পড়েছেন ঠিক সেই সময় মেয়ে সুনন্দা কলেজ থেকে এসে মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পরলে সেই সুযোগে সটকে পড়েছেন। অগত্যা মেয়েকে হাতের কাছে পেয়ে দুধটা খেয়ে নেওয়ার জন্য জোর করে। কিন্তু তাকেও কোনভাবে দুধ খাওয়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বড় ছেলে দিব্যেন্দু অফিস থেকে ফিরে এলে তাকে ধরেন দুধ খাওয়ার জন্য। কিন্তু মা এবারও ব্যর্থ হয়ে যায়। এইভাবে একেকজনকে মা ধরছেন, দুধের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু প্রত্যেকে তার মত করে একেকটি অজুহাত তৈরি করছে এবং সেই অজুহাত দিয়ে মায়ের দেওয়া দুধ খাওয়া এড়িয়ে যাচ্ছে। এই অজুহাত তৈরি করা এবং এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই নাটককার একদিকে যেমন সংলাপের মজা তৈরি করেন তেমনি অন্যদিকে সিচুয়েশনের কৌতুক গড়ে তুলতে থাকেন।

এই নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র দিব্যেন্দু। হাসি এবং মজার পাশাপাশি নাটককার দিব্যেন্দুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও একটি নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন। শনিবার অফিস থেকে ফিরেও কাজ করতে হচ্ছে দিব্যেন্দুকে। অফিসের বস বাসু সাহেব বিশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র সমস্ত তৈরি করে রবিবার জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দিব্যেন্দুর মাথা গরম হয়ে গেছে। ক্লান্ত দিব্যেন্দু কাজ করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর অফিসের কাজের স্বপ্ন দেখে। অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এসব নিয়ে স্বপ্ন দানা বাঁধে। সে প্রমোশনের স্বপ্ন দেখে; স্বপ্নে একেবারে প্রমোশন পায় তিন ধাপ ওপরে— এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর। এ নিতান্তই একজন কেরানির স্বপ্ন, কেরানির আকাঙ্ক্ষা। বোন সুনন্দার ডাকে হঠাৎ সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় দিব্যেন্দুর। সুনন্দা বলে তার বান্ধবী সাগরিকা এলে যেন সে তাকে ডেকে দেয়। সাগরিকার কথা শুনে দিব্যেন্দু চুল ঠিক করে জামা পরে বাইরে তাকায় কাজ করতে আর মন বসে না। মনে জেগে ওঠে অন্য এক স্বপ্ন। সাগরিকার উপস্থিতিতে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায় সে। ভেঙে যায় স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ভাঙলে অফিসের বস বাসু সাহেবের উপর রাগ হয় প্রচণ্ড। শেষ পর্যন্ত অফিসের বেয়ারা এসে খবর দেয় যে দিব্যেন্দুকে ওই প্রজেক্টের কাজ করতে হবে না। অনেক বড় কন্ট্রাক্ট পেয়ে বাসু সাহেব বোম্বাই যাচ্ছেন। এ খবর পেয়ে দিব্যেন্দু মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নাটকের মধ্যে কেরানির মনস্তত্ব ফুটে উঠেছে। দিব্যেন্দুর অনুষঙ্গে অফিসের সহকর্মী পরিতোষের

মাধ্যমে অফিসের কর্মপদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে দিবেদ্যন্দু চরিত্রের মধ্যে কেবল কেরানির টাইপই পরিস্ফুট হয়নি, তার স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। তবে এই স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠেছে তার স্বপ্নময়তার ভেতর। সাগরিকাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছে। সাগরিকাকে দিব্যেন্দুর তুমি সম্বোধন করতে ভয় করে। সাগরিকা জানতে চায় কিসের ভয়? দিব্যেন্দু সমুদ্রের বর্ণনার ভেতর দিয়ে তাকে বোঝায় 'আপনি' ও 'তুমি' সম্বোধনের তাৎপর্য। দিব্যেন্দু বলে—

> ''নীল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ছুটে আসে সে যে ঢেউ— তাতে অপরিচয়ের রহস্য, সে 'আপনি'। তীরে এসে সাদা ফেনায় ভেঙে পড়ে যে প্রকাশ তাতে রসহ্য নেই, কিন্তু দীপ্তি আছে, সান্নিধ্য আছে। সে 'তুমি'।''[৩০]

এই অনুভবে দিব্যেন্দু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সে সম্বোধনের ভেতরে সম্পর্কের তাৎপর্যকে অপূর্ব কাব্যিকতায় তুলে ধরতে পারে। তার বিশেষ একটি চেতনা প্রকাশ পায় আর একটি সংলাপে— যেখানে সে বলছে যে সে কবিতা লেখে না, কবিতা ভাবে। ''মনের মধ্যে কবিতা জমে ওঠে মেঘের মতো। যদি আঘাত পায়, ঘন বর্ষার ধারায় নেমে আসে।''[৩১] ঐ আঘাত 'আপনা'কে 'তুমি' বলতে পারার মতো আঘাত। এখানে হাস্যরস সিচুয়েশন নয়, আমরা পৌঁছে যাই অন্য এক দর্শনে। কেরানি যখন কবিতা ভাবে সে তখন কোন কর্মসূত্রে পরিচিত হয় না। প্রাণচঞ্চল এক মানুষ যার ভেতরে সেই আনন্দময় অনুভূতিপ্রবণ মন রয়েছে তাকে দেখতে পায়। দিব্যেন্দু ভেতরকার সেই অন্তরঙ্গ মানুষটিকে যেন ধরা যায় এই অংশে এসে। সিচুয়েশন আর কমেডির মজার মুহূর্ত পেয়ে যায় অন্য এক গভীরতর মাত্রা। 'শনিবার' তখন আর শুধুমাত্র একটি হাসির নাটক হয়ে থাকে না। আসলে এই নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনের বেদনাকে অতিক্রম করে হাসি, মজা বড় হয়ে উঠেছে। নাটকটির দুঃখের সমস্যাকে হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে, হেসে তার মোকাবিলা করতে চেয়েছেন।

বাদল সরকার এরপর লেখেন '**রাম শ্যাম যদু**' নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬১। তবে ১৯৫৭ সালে নাটকটি লেখা শুরু করলেও শেষ করেননি তখন। অভিনয়ের জন্য নাটকের প্রয়োজন হলে তখন তিনি এ নাটকটি লেখা শেষ করেন। নাটককার নাটকের 'বক্তব্য' অংশে বলেছেন—

> ''একটি বিদেশি ছবি দেখিয়া ভাল লাগিয়াছিল। বাংলায় তাহার মঞ্চোপযোগী রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলাম ১৯৫৭ সালে। তখন শেষ করতে পারি নাই।
>
> চার বৎসর পরে 'চক্র' যখন আমার 'বড়ো পিসীমা', 'সলিউশন এক্স' ইত্যাদি নাটক লইয়া মঞ্চে হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন, তখন কিছুটা নূতন উৎসাহে, কিছুটা

তাগাদায় পড়িয়া পুরাতন লেখাটি ধরিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম।"[৩২]

তিন অঙ্কের একটি হাসির নাটক হিসেবে ততখানি উৎকৃষ্ট নয়। এর মধ্যে এমন কোন হাস্যকর পরিস্থিতি নির্মাণ নেই যা আমাদের ভাবিয়ে তুলবে বা বিশুদ্ধ হাস্যরসের মধ্যে শৈল্পিক আনন্দ মননে রেখাপাত করবে। নাটককার বলেই দিয়েছেন এই নাটকের কাহিনি একটি বিদেশি সিনেমার উপর আধারিত। একদিন চুরি করার মতলবে রাম-শ্যাম-যদু এই তিনজন সমাজ বিরোধী লোক ভবানী চৌধুরী নামক এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে পরে। ঘটনাচক্রে চুরির জায়গায় তারা হয়ে উঠে ওই পরিবারের সদস্য। ভবানীর পিতা যাকে এতদিন সন্তানবৎ মানুষ করেছিল সেই শুকদেবই আজ ভবানীকে ঠকিয়ে বড় ব্যবসায়ী হয় এবং ভবানী চৌধুরীকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। রাম শ্যাম যদু এটা জানতে পেরে শুকদেব এবং তার অর্থলোভী পুত্র জয়দেবকে উচিৎ শিক্ষা দেয়। ভবানীর কন্যা অরু রাম শ্যাম যদুকে কাকা বলে আপন করে নেয়। তারা অরুর মনোবাঞ্ছিত বর জোগাতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক কথায় সমাজে যাদেরকে চোর বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের মধ্যেও যে মানবিক গুণ থাকতে পারে, তার একটা সোজাসাপটা গল্পকে বাদল সরকার এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকের সহজ সরল ভাষা, সহজ সরল চিন্তা-ভাবনা, সবকিছুই ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে। রাম-শ্যাম-যদুর কৌশলগুলো নাটকের মধ্যে হাস্যরসের ভাব এনে দেয়। তবে বিশুদ্ধভাবে শৈল্পিক বিন্যাস তেমনভাবে চোখে পড়ে না। প্রতিভা অগ্রবাল লিখেছেন—

> "না কোনো জোর হাসির জায়গা, না হঠাৎ কোনো অঘটন ঘটার জোর ঝাঁকুনি।
> সবকিছু ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে এগোয়।"[৩৩]

নাটককারের বক্তব্যেই ফিরে এসে বলতে হয় অভিনয়ের অভাব পূরণের জন্য লেখা এ নাটক, এর ভেতর শিল্পভাবনা হয়ত সেকারণে তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। নাটককার তাই হয়তো রচনা শুরু করেও ফেলে রেখে দিয়েছিলেন শেষ না করেই। প্রযোজনাই এ নাটক রচনার কারণ।

বাদল সরকারের হালকা লঘু রসের নাটকগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো **'বল্লভপুরের রূপকথা'**। এ নাটকের রচনাকাল ১৯৬৩-৬৪। প্রথম মঞ্চায়িত হয় ১৯৭০-এ প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ। প্রযোজনায় 'শতাব্দী', নির্দেশনায় ছিলেন বাদল সরকার নিজে। অক্টোবর ১৯৫৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯-এই দু'বছর বাদল সরকার লণ্ডনে ছিলেন। সেখান বাসকালে একটি বহু পুরাতন বিদেশি সিনেমা— 'ইউ আর নো এঞ্জেলস' দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বল্লভপুরের রূপকথা' নাটক রচনা শুরু করেন। তবে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তখনকার মত লেখা শেষ করতে পারেনি। কয়েক বছর পর ১৯৬৩ সালে ফ্রান্সে থাকাকালীন অসমাপ্ত 'বল্লভপুরের রূপকথা'

লেখা শেষ করেন। বাদল সরকার ফ্রান্স থেকে বোন মনুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

> ''লণ্ডনে দেখা একটি বিদেশী ছবির গল্প নিয়ে এখানে আসবার কিছুদিন পরে নাটকটা শুরু করেছিলাম। প্রায় জোর করে। হাল্কা হাসির নাটক।''[৩৪]

'বল্লভপুরের রূপকথা' বাদল সরকারের কমেডি নাটক রচনার ধারায় একটু অন্যরকম নাটক। রূপকথার একটা আঙ্গিক যেন তিনি নিজেই রচনা করতে চান। যে ধরনের রূপকথা প্রচলিত আছে তার মতো নয়, তাদের কোন কাহিনি নিয়ে নয়, এ নাটক বাদল সরকারের নিজস্ব তৈরি এক রূপকথার কাহিনি নিয়ে নির্মিত। নাটকের প্রথম দৃশ্যে সঞ্জীব বোসের আড়ালে নাটককার নিজেই সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> ''বল্লভপুরের রূপকথা আপনারা শোনেননি, কারণ এটা ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝোলা, দাদুর দপ্তর— কোনোটাতেই নেই। ভূপতি আমাকে পাঠালো আপনাদের বল্লভপুরের রূপকথা শোনাতে। আমি খুব একটা দরকার দেখি না। কোনদিনই এটাকে খুব একটা জমাটি রূপকথা বলে মনে হয়নি আমার। ...
>
> এক ছিল রাজা, তার নাম ভূপতি রায়। তার ছিল— না, তার রানি ছিল না। একটাও না। আসলে তাকে রাজপুত্র বলা উচিত রানি যখন নেই— কিন্তু তার বাবা-মা নেই। এইখানেই দেখুন— প্রথম গোলমাল। রূপকথায় কখনো দেখেছেন কোনো রাজা পুত্রের বিয়ে না চুকিয়ে মারা গেছে?''[৩৫]

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে এ রূপকথা নাটককারের মস্তিষ্ক প্রসূত। নাটকের নায়ক ভূপতি বারোভূঁইয়াদের বংশধর। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বাড়ি বিক্রি করতে চান। একদিন বিকেলে আগের থেকে কোনো খবর না দিয়ে ক্রেতা শ্রীহালদার তার স্ত্রী ও কন্যাসহ উপস্থিত হয় ভূপতির বাড়িতে। ভূপতি তাদের আতিথ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে হালদারের প্রতিস্পর্ধী চৌধুরী এসে পড়েন, যাতে হালদার সস্তায় বাড়ি না কিনে ফেলেন। এদিকে নানা মজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একের পর এক সব থেকে মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো রঘুদাকে নিয়ে। রঘুদা হল ভূপতির পূর্বজ, যিনি বহু বছর থেকে মৃত হয়ে এই বাড়িতে বাস করছিলেন আর বাড়ি বিক্রি হলে মুক্তি পাবেন এই আশায় ছিলেন। যাইহোক সবশেষে বন্ধু সঞ্জীব আর আশেপাশের লোকেদের সাহায্যে বাড়ি বিক্রির পাকা কথাবার্তা হয়, রঘুদা মুক্তি পেল আর হালদারের কন্যা ছন্দা আর গ্রগতির মধুর সম্পর্ক পাকাকথার রূপ নেয়।

বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' নির্মল হাসির নাটক, পরিস্থিতিজনিত হাস্যের একটি আদর্শ উদাহরণ। না ব্যঙ্গ না কটাক্ষ, না কোনো রকমের ভাঁড়ামি। আরেকটি বিষয় হলো সেট এ নাটকে অনিবার্য। যাতে সব সময় দর্শকের চোখের সামনে ভূপতির পুরনো মহল উপস্থিত থাকে,

সেখানে যিনি বাস করেছেন, ভূপতির পুরনো দিনের বৈভব আর বর্তমান পরিস্থিতি চোখের সামনে থাকে আর রঘুদার এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে কিংবা অদৃশ্য হতে সুবিধা থাকে। এ নাটকের যাবতীয় ঘটনা আবর্তিত হয়েছে রঘুদা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। রঘুদা ছিল একটা ছোট ভূস্বামী বা ভূঁইঞার সন্তান। মুঘল আমলে বঙ্গদেশে বারোভূঁইঞাদের প্রবল প্রতাপ ছিল, যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। রঘুনাথ বা রঘুদা অবশ্য সেই বারোভূঁইঞাদের কেউ না। তার পূর্বপুরুষ ছিল বারোভূঁইঞার বাইরেও যে ছোট ছোট ভূঁইঞারা বঙ্গদেশে ছিল তাদেরই একজন। যার সঙ্গে একেবারে এ প্রজন্মের মেয়ে ছন্দার প্রেম হয়। প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের প্রেম আসলে আমাদের শেকড় বা উৎসের সঙ্গে সংযোগের বিশেষ ব্যঞ্জনা বয়ে আনে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ-এর মিলন যে বর্তমানে কথাটি অসাধারণ ব্যঞ্জনা পায় এখানে।

নাটকের শেষের দিকে ঘটনার চমক সৃষ্টি হয়েছে রঘুদাকে কেন্দ্র করেই। রঘুদা মারা গেছে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তার অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি পাবে যদি তার সময়কার পাশের অঞ্চল প্রতাপগড়ের ইন্দ্রনারায়ণ ভূঁইয়ার কোন বংশধরকে 'নাকখৎ' দেওয়ানো যায়। ঘটনাক্রমে অন্য এক অনুসন্ধানী প্রতিযোগী চৌধুরী সাহেব প্রতাপগড়ের ইন্দ্রনারায়ণ ভূঁইয়ার বংশধর যারা আলিবর্দি খাঁর আমলে চৌধুরী খেতাব লাভ করেছে। সেই শিল্পপতি চৌধুরীকে দিয়ে নাকখৎ দিইয়ে রঘুদার মুক্তি হয়ে যায়। এই বিষয়টিকে খুব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''অতীত-ভবিষ্যৎ এক হয়ে গিয়ে বর্তমান কালের নবরূপকথার সৃষ্টি করে বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা'। ভূস্বামীর শোষণের স্খালন ঘটলো উত্তরপুরুষের নাকেখৎ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে!!''[৩৬]

এই পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে তাতে আমরাও প্রবিষ্ট হয়ে যাই। আমাদের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব এসে যায় ভূঁইয়াদের জন্য। রঘুদা তখন সাহিত্যের সেই বৃহত্তম ব্যঞ্জনাময় সত্য হয়ে ওঠে। এখানেই নাটককারের সিদ্ধি।

বাদল সরকার যে কয়েকটি হাসির নাটক লেখেন তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী নাটক হলো **'কবি কাহিনী'**। আগের কমেডি গুলিতে শুধুই হাস্যরস রয়েছে তার বাইরে অন্য কিছু নেই। সমাজ ও সমকালের যুগসমস্যার কোন ইঙ্গিত নেই। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এর আগের লেখা চারটি নাটকে ভালো করে বাঁধা গল্প আছে, এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে পৌঁছানো হয়েছে। নাটকের আরম্ভ আর শেষ স্পষ্ট আছে। 'কবি কাহিনী'-তে সেটা নেই। শুরু থেকেই নাটকের দুটি দিক

আছে—একটা সাহিত্যিক অন্যটা রাজনীতিক। নাটককার দু-ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত অতিরিক্ত উৎসাহ, মানুষকে ঠকানোর প্রবৃত্তি, নিজের আনন্দের জন্য ভুল কাজগুলি করা প্রভৃতির জোরদার বর্ণনা করেছেন। এইসব করতে গিয়ে, কিছুদুর পর্যন্ত নাটক অনেকটা রহস্য নাটকের রূপ নিয়েছে। যদিও নাটককারের মূল লক্ষ্য হাসির নাটক লেখা, তবে হাসির পাশাপাশি এই নাটকে সাহিত্য রচনা, সাহিত্যিকদের স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয়ও উঠে এসেছে। আবার ভোট রাজনীতির নোংরামিরও বর্ণনা আছে। 'সলিউশন এক্স', 'বড় পিসিমা', 'রাম শ্যাম যদু' কিংবা 'বল্লভপুরের রূপকথা'র মতো 'কবি কাহিনী' বিশুদ্ধ হাসির নাটক নয়। নাটকের বক্তব্য একটু জটিল তবে গল্প এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে লাফ দিয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। 'ভোটরঙ্গ' এবং 'আধুনিক কবিতা' দুর্বোধ্য এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হাসির পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন নাটককার।

নাটকে মোট দৃশ্য সংখ্যা চার। এর মধ্যে অনেকটা জুড়ে রয়েছে মণিভূষণ মজুমদার ও চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর ভোটরাজনীতি নিয়ে নানা মজাদার ঘটনা। আর অন্যদিকে রয়েছে বাংলার শিক্ষক সনৎ ও কানাই দত্ত ওরফে কবি স্মরজিৎ সান্যালকে নিয়ে নানা হাসি মজার মুহূর্ত। মণিভূষণ মজুমদার এবং চিদানন্দ ব্রহ্মচারী দুই যুযুধান পক্ষ। নাটকে চিদানন্দ অনুপস্থিত হলেও তার উপস্থিতি এত অনিবার্য করে তুলেছেন নাটককার যা হাস্যরসের পরিস্থিতি নির্মাণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। উভয়ই 'স্কোপ' খুঁজতে ব্যস্ত। কী করে একে অপরের ক্ষতি করতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে এই চেষ্টা নিরন্তর করে চলে। চিদানন্দ মণি মজুমদারের কলেজ জীবনের ম্যাগাজিন থেকে তার সাহেব সেক্রেটারির গলায় মালা দেওয়ার দৃশ্য তুলে লিফলেট বিলি করেছেন, যেমনটা করে থাকেন বাস্তবের রাজনৈতিক নেতারা। অন্য লিফলেটে দেখিয়েছেন মণি মজুমদার পত্নী সুপ্রীতি দেবীর সাহিত্য প্রীতির নিদর্শন। ভাস্বতী পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় অমানিশা দেবীর (সুপ্রীতি কন্যার ছদ্মনাম) 'হানিয়াছ মোরে' কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসের কথা আছে এই অভিযোগ তুলে জোরদার প্রচার করে চিদানন্দ। এই সূত্র ধরে মণি মজুমদার তার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি যে স্কুলের সেক্রেটারি তার বাংলার শিক্ষক সনৎ বাবুকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আনে। তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকে কাজে লাগান। সনৎ বাবু নিরুপায় হয়ে এই তাবেদারি করতে বাধ্য হয়। কারণ তিনি 'প্রবেশনে'। এদিকে জনপ্রিয় আধুনিক কবি স্মরজিৎ সান্যালকে সাহিত্যসভায় এনে বিশেষভাবে মহিলা ভোটারকে স্বামীর পক্ষে টানতে চান সুপ্রীতি দেবী। ধুরন্ধর চিদানন্দের দল সে আমন্ত্রণপত্র গায়েব করে এবং তার কাগজের সাংবাদিক কানাই দত্ত স্মরজিৎ সান্যাল সেজে মণি মজুমদারের বাড়িতে আসে। কানাই দত্ত বাংলার শিক্ষক সনৎ-এর পরিচিত। ফলে পরিস্থিতি ঘনিয়ে ওঠে। অন্যদিকে মণি মজুমদারের লোক মোহন চিদানন্দের দাদা সদানন্দের কলেজ জীবনের কেলেঙ্কারি বের করে এনেছে ছবিসহ। কিন্তু এটা

জানতো না, যে মহিলা তার সঙ্গে জড়িত সেই স্বর্ণলতা ভদ্র মণি মজুমদারের দলীয় টিকিটে অন্য একটি কনস্টিটুয়েন্সির (গামুনিয়া) ক্যাণ্ডিডেট। সে আর এক কাণ্ড। অটলবাবু যিনি মণি মজুমদারের দলের ওপর তলার নেতা, সে মণি মজুমদারের বাড়িতে কানাই দত্ত ওরফে স্মরজিৎ সান্যালকে দেখে ফেলে। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়। কানাই দত্তকে চেনার দায়ে সনৎ-এর চাকরি প্রায় যায় যায়! এই আপাত আতঙ্কের মধ্যেই মজা জমতে থাকে এবং পরিস্থিতির কৌতুক অনবদ্য হয়ে উঠতে থাকে। কবি হয়ে গিয়ে কানাই ঘটনাচক্রে সুপ্রীতি-লিলির মন জয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে— সবমিলিয়ে দারুণ হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নাটকে। পরিস্থিতিই কানাই দত্তকে কবি সাজতে বাধ্য করেছিল। যে কোনদিন কবিতা কী জিনিস জানে না, সে আজ কবি হয়ে, পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। কানাই দত্ত অসহায় হয়ে তাই বলেছে— ''কবিতা? আমার বাবাও কোনদিন কবিতা লেখে নি!''[৩৭] তাছাড়া কবি স্মরজিৎ সান্যাল সেজে কবির বেশ ধারণ করলেও তার কোন কবিতাই কানাই জানেনা, মুখস্থ থাকা তো দূর অস্ত। সেই কানাইকে অর্থাৎ নকল স্মরজিৎ সান্যালকে প্যাঁচে পড়ে মণি মজুমদারের স্ত্রী সুপ্রীতি ও তার কন্যা লিলির মন রাখার জন্য কবিতা বলতে হয়। আর এই কবিতা লেখার কৌশল জানতে জানতে দর্শক কিংবা পাঠক হাস্যরসে উতরোল হয়ে ওঠে।

কানাই দত্ত ভাস্বতী পত্রিকা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও লাইন একটু মিলিয়ে তৈরি করে নেয় এক নিজস্ব কবিতা। কবিতাটি এরূপ—

'কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম।
রুচি? সে তো অলঙ্কার—
বিশুদ্ধ ও খাঁটি।
অনুসন্ধান করো—
সম্পাদনা।
প্রীতি ও শুভেচ্ছা—
অতি-বেগুনী রশ্মির বিকীরণ
নিউট্রন
ইলেকট্রন
—দুঃসংবাদ!
সুজাতা তবুও স্তব্ধ,
অনেক রাত।
যদি জানিতাম তুমি আছ!

কিন্তু আজ

আগামী সংখ্যার সমাপিকা।”[৩৮]

কীভাবে এই কবিতা রচিত হল তার রহস্য উন্মোচন করেছে সনৎ-এর কাছে—

‘‘ছাপা রে বাবা, ছাপা, ভাস্বতীতে সব বেরিয়েছে। এই নে, ধর। (কবিতাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া সনৎকে দিলেন, নিজে ভাস্বতী তুলিলেন।) পড়ে যা!

সনৎ: কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম—

স্মরজিৎ : প্রথম পাতা-সাবানের বিজ্ঞাপন। তারপর?

সনৎ: রুচি? সে তো অলঙ্কার—

স্মরজিৎ: রুচিসম্মত অলঙ্কার— নন্দী জুয়েলার্স, প্রাইভেট লিমিটেড।

সনৎ: বিশুদ্ধ ও খাঁটি—

স্মরজিৎ: গব্যঘৃত।

সনৎ: অনুসন্ধান করো—

স্মরজিৎ : অনুসন্ধান করুন তিপ্পান্ন নম্বর ইত্যাদি— বিজ্ঞাপন চলছে এখনো—

সনৎ: সম্পাদনা—

স্মরজিৎ: সুপ্রীতি মজুমদার।

সনৎ: অ্যাঁ?

স্মরজিৎ: আরে ভাস্বতীর সম্পাদনা। পয়লা পাতায় এসেছি।

সনৎ: প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

স্মরজিৎ: সম্পাদকীয়র শেষ কথা।

সনৎ: অতি-বেগুণী রশ্মির বিকিরণ, নিউট্রন, ইলেকট্রন, দুঃসংবাদ।

স্মরজিৎ: ইলেকট্রন অবধি প্রবন্ধটা—‘বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান’। ‘দুঃসংবাদ’ পরের গল্পে।

সনৎ: সুজাতা তবুও স্তব্ধ। অনেক রাত—

স্মরজিৎ: গল্প চলছে।

সনৎ: যদি জানিতাম তুমি আছ—

স্মরজিৎ: অ্যাই! এইখানেই কেঁচে গেলাম। নইলে এর মালটাই চলে যেত বেশ! তখন কি জানি ছাই, অমানিশাদেবী সম্পাদিকার কন্যা?”[৩৯]

এইভাবে একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের নানা পঙ্‌ক্তি ও গল্প প্রবন্ধের লাইন জুড়ে কবিতা বানানোর রসিকতা নাটকে নির্মল হাস্যরস তৈরি করেছে। একই সঙ্গে আধুনিক কবিদের দুর্বোধ্য কবিতা রচনাকে নাটককার এভাবেই মজাদার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে খানিকটা শ্লেষাত্মক ভাবে তুলে ধরেছেন। এটা ঠিক যে শ্লেষ-ব্যঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়ার নাটককার বাদল সরকার নন। তবে এই নাটকে সিচ্যুয়েশনাল কমেডি মধ্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিটি আমাদের নজর এড়ায় না।

আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি এই নাটক বাদল সরকারের অন্য কমেডি নাটকগুলির থেকে একটু অন্যরকম। বিশিষ্ট সমালোচক বিষ্ণু বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে 'রাম শ্যাম যদু' নাটকের সঙ্গে তুলনা করে 'কবি কাহিনী' নাটককে বিশুদ্ধ কমেডি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''... এ দুটি নাটক শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ কমেডিই থেকে যায়, স্যাটায়ারে আক্রান্ত হতে অস্বীকার করে।''[৪০]

স্বয়ং বাদল সরকারও 'কবি কাহিনী' নাটকের 'মুখবন্ধ'-এ প্রায় একই রকম দাবি করেছেন। তাঁর কাছে দরকার শুধু 'হাসি বা হাসানো'[৪১] কিন্তু 'কবি কাহিনী' কি শুধুই হাসি বা হাসানোর উদ্দেশ্যে রচিত? অন্য কিছু না! এ নাটক কি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বিশুদ্ধ কমেডিই হিসেবেই থেকে যায়? আমাদের মনে হয় তা কিন্তু নয়। আসলে বাদল সরকার এখানে সমাজের জটিলতম সমস্যাকে হাসির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে 'কবি কাহিনী' নাটকের 'মুখবন্ধ'-এ বাদল সরকারের নিজের মন্তব্য। তিনি বলেছেন—

> ''আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছে করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে— আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি। তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়।''[৪২]

অর্থাৎ মানুষের জীবনে সমস্যা থাকবে তাকে হেসে মোকাবিলা করাটাই মানুষের কাজ, সেখানেই হাসির মূল্য অপরিসীম। কানাই দত্ত ওরফে স্মরজিৎ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধরা পড়লে প্রাণ সংশয় হতে পারে এ রকম জটিল সমস্যার মুখেও সনৎকে স্মরজিৎ ছদ্মবেশী কানাই দত্ত বলেন, 'এই, ও রকম প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকলে দুজনেই ডুববো। হাস্ তো একটু? ... ও রকম না, বেশ জোরে।'[৪৩]

বস্তুত নাটককার সমস্ত বাঙালিকেই এর অংশীদার করতে চান। জটিল যৌগ সমস্যায় সুস্থভাবে হেসে সমস্ত মোকাবিলা করা উচিত। সে কারণে '... সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে... মনে হয় না।'[৪৪] নির্মল হাসির মধ্যেও নাটককারের নিজস্ব যুগ-সমস্যা বা বক্তব্য উঠে এসেছে এ নাটকে।

নাটকে দেখা যায় মণি মজুমদার দলের উপর নেতৃত্বকে তোষামোদ করে ক্যান্ডিডেট হয়, অন্যদিকে চিদানন্দ ভোটের প্রয়োজনে গেরুয়া ধরেন যিনি একটা সময় অশ্লীল কবিতা লেখাতে ওস্তাদ ছিলেন। আদর্শহীন রাজনীতিতে পরস্পর পরস্পরের চরিত্র দোষ খুঁজতে ব্যস্ত। কারণ 'স্কুপ্ ছাড়া ইলেকশন হয় না।'[৪৫] আর আদর্শ? অরবিন্দর ভাষায়— 'হ্যাঁ, খাটে সিঙ্গাড়ার জন্য। পিছনে কোন ইডিওলজিক্যাল—'[৪৬] আজকের দিনে একথা কতখানি প্রাসঙ্গিক তা সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর এখানেই সমাজ সম্পৃক্ত বাদল সরকারের নিজস্ব জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়, যে জীবন ক্রমশ নির্মাণ করেছে তাঁর নিজস্ব ভূমি বা ক্ষেত্র। কেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। চল্লিশের দশকের শেষ পর্বের সুস্থির সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ, এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। বাদল সরকার জানিয়েছেন—''থিয়েটার তখন তুচ্ছ। সে সময়ও ছিলনা, পড়াশুনো আর অবসর সময়ে তখন রাজনীতিতে সময় দেওয়াই একমাত্র প্রধান কাজ ছিল। এই রকম বেশ কিছুদিন চললো। তারপর কোন কারণে রাজনীতি আর করা গেলনা। রাজনীতি করার আকর্ষণ একদম নষ্ট হয়ে গেল।''[৪৭]

'কবি কাহিনী' নাটকে হয়তো এই কারণেই বাদল সরকার রাজনীতির নীতি আদর্শহীনতাকে তুলে ধরেছেন। কেন আশা ভঙ্গহল সেই প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি, বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নীরবে নাটকের ভিতর। পরবর্তীকালে তৃতীয় ধারার নাটকে অনেকটা তা স্পষ্ট করেছেন, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

রাজনীতির ওই আশাভঙ্গের প্রসঙ্গে তিনি অদ্ভুতভাবে নীরব থেকেছেন, এড়িয়ে গেছেন এসব প্রশ্নের উত্তর। এ বিষয়ে আমরা তাঁকে কখনো কোন আক্রমণাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতে দেখিনি। যেমন নাটকেও কোন ব্যঙ্গের কশাঘাত নেই। অথচ নিজস্ব স্বরটি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

দুই.

এবার আসা যাক বাদল সরকারের সিরিয়াস নাটক প্রসঙ্গে। অনেকে মনে করেন যে বাদল সরকার প্রথমে হাসির নাটক রচনা করে কিছুটা হাত পাকিয়ে পরবর্তীকালে সিরিয়াস নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু নাটককার বাদল সরকার সম্পর্কে এই ধরনের মূল্যায়ন ঠিক নয়। 'কবি কাহিনী' নাটক তাঁর বহুচর্চিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রায় এক বছর পরে রচিত। আসলে বাদল সরকারের কাছে হাসির নাটক এবং সিরিয়াস নাটক দুটো'ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যখন যেটা পেরেছেন তিনি

লিখেছেন। বাদল সরকার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখেছেন—

> ''অনেকে বলেছেন, আমি না কি হাসির নাটক লিখে হাত পাকিয়ে তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস' ইত্যাদি 'ভালো' নাটক লিখতে শুরু করেছি। এ কথায় আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে— দু'টো কারণে। প্রথমত কথাটা পুরো সত্যি নয়। 'কবি-কাহিনী' এবং আরো কিছু হাসির নাটক আমি লিখেছি 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লেখার পরে। পারলে আরো লিখবো।''[৪৮]

সুতরাং বুঝতেই পারছি যে বাদল সরকার প্রথমে হাসির নাটক লিখেছেন এবং পরে সেখান থেকে পুরোপুরি সরে এসে সিরিয়াস নাটক লিখছেন— এমনটা নয়। বাদল সরকার যখন তৃতীয় ধারার নাটক লিখছেন তার মধ্যেও 'খাট মাট ক্রিং'-এর মতো অসাধারণ হাসির নাটক লিখেছেন— যদিও আঙ্গিকগত প্রভেদ রয়েছে। সে আলোচনা অন্যত্র করা হবে। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের বাঁধা মঞ্চের জন্য লিখিত সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি বাদল সরকারের প্রসেনিয়াম তথা বাঁধা মঞ্চের নাটকগুলির মধ্যে বেশকিছু নাটক আছে যেখানে সমাজ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবন প্রধান বর্ণিত বিষয়। কমেডি নাটক লিখছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে চলছে নানা ভাঙাগড়া। বাদল সরকার লিখেছেন— ''এখন কমেডি লিখছি ঠিকই কিন্তু কতগুলো কথা তো ভেতরে বলবার থাকে...।''[৪৯] জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা প্রবল নৈরাশ্য, প্রত্যয়হীনতা তাঁকে যেন তাড়িত করছে ভিতরে ভিতরে। তাঁর এই মানসিক অবস্থার সাক্ষ্য রয়েছে সেই সময় লেখা ডায়রি ও চিঠিপত্রে। আমরা এখানে তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্রের থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

ক. ''... মধ্যে মধ্যে হঠাৎ যেন মনে বিদ্যুতের ঝলক লাগে। সেই চকিতের ঝলকে সব কিছুর অন্তঃসারশূন্যতা হঠাৎ অতি উজ্জ্বল অতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।''[৫০]

—০৯.০১.৫৮ লেখা ডায়রি।

খ. ''চূড়ান্ত অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছি।''[৫১]

—১৪.০৩.৫৮ লেখা ডায়রি।

গ. ''... আমার অস্তিত্ব একটা পিঁপড়ের একটা জীবাণুর অস্তিত্বের মত অকিঞ্চিৎকর। আমার জীবন অসীম কালের মধ্যে মুহূর্তমাত্র। আমার যতো কাজ, যতো চলাফেরা কাঁদা হাসা বিরাম পরিশ্রম— সব অকিঞ্চিৎকর, অর্থহীন, মূল্যহীন।''[৫২] —১৬.০৮.৫৮ লেখা ডায়রি।

ঘ. ''আমি অর্থহীন হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। মিলিয়ে যাচ্ছি হাওয়ায়। উবে যাচ্ছি। মুছে যাচ্ছি। নিঃশেষ হয়ে মুছে যাচ্ছি।''[৫৩] —০৬.০১.৬৪ লেখা ডায়রি।

ঙ. ''...ভয়। একটা একটানা এক ঘেয়ের ভয়। একটা একটানা একঘেয়ে মিথ্যের মধ্যে বেঁধে রেখে দিয়েছে আমাকে। নিজেকে স্বীকার করতে না পারা। স্বীকার করি— ভিতরে। মনের ভিতরে। বাইরে নয়। কখনো নয়। ভয়।''[৫৪] —২৮.০২.৬৪ লেখা ডায়রি।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে মানুষটা জীবনটাকে হাসি দিয়ে মজা দিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন, জীবনের চরম ট্র্যাজেডিকেও যিনি হাসি দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন, তাঁর মনের ভিতরে এ কোন যন্ত্রণা বাসা বেঁধেছে! কেন এই অন্তঃসারশূন্যতা, জীবনের প্রতি অনীহা!

বাদল সরকারের এই ধরনের চিন্তা চেতনার মূলে রয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা বিশ্বকে একটা ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে ফেলে দেয়। এই সময় চলে নানা পালাবদল। বস্তুত পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক-এই সময়পর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে ২৩ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ন্যাৎসিদের দণ্ড দেওয়া হল। এর ঠিক এক বছর পর ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইন ভাগ হয়ে গেল এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েল নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ১৯৪৯ সালে জেনারেল মাও জে দং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৫০ কোরিয়ায় শুরু হলো দীর্ঘকালীন যুদ্ধ। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যু। ১৯৫৯ সালে কিউবায় একনায়ক শাসনের অবসান এবং ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সরকারের পত্তন। ১৯৬২ সালে ভারত চীনের যুদ্ধ। এদিকে ১৯৬৩ সালে গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করলেন নে উইন। ওই বছরই ভারত ও চীনের যুদ্ধ পরিসমাপ্তি। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। ১৯৬৫ সালে আমেরিকা ভিয়েতনাম আক্রমণ করে। দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন স্থায়ী শান্তির আশা দিতে পারল না। একটা চরম অস্থিরতা এই সময় পৃথিবীকে গ্রাস করে। এর থেকে মুক্তির কোনো পথ কারো জানা ছিল না। সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেরও অবস্থা তখন করুণ। ভারতবর্ষ এবং তৎসঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তখন চরম সংকটের মুখে। স্বাধীনতা, আনন্দ, স্বপ্ন পূরণ এবং স্বপ্নভঙ্গের অভিঘাত কাটিয়ে দেশ জুড়ে তখন রাজনৈতিক সংঘাত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। খাদ্য আন্দোলন, দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংঘর্ষ, সরকারি বিরোধিতা ইত্যাদি অপেক্ষা করেই রাতারাতি কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে গড়ে ওঠে অজস্র জবরদখল কলোনি। কলকাতা রাজপথ তখন বাস্তুহারার আর্তনাদে মুখরিত। স্বাধীন দেশের কমিউনিস্টদের ওপর নেমে এলো বর্বর অত্যাচার।

১৯৬২ সালের ভারত চীনের যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে। ১৯৬৪

সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল। এদিকে কৃষি বাণিজ্য বা শিল্পে নেমে এলো চরম বিপর্যয়। একের পর এক ছোট-বড় শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে বেকারি সমস্যা। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল— আদি কংগ্রেস এবং ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস। আর ওই বছরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কার্যত প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলো। আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘর্ষ, হত্যা, আক্রমণ। এককথায় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক ভয়ংকরতম অধ্যায়। গোটা ভারতবর্ষে জুড়ে তখন এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। এরই মাঝে ১৯৭৫ সালে ২৫ শে জুন, দেশে জারি হল জরুরি অবস্থা। একটা দমবন্ধ পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দিনগুলি-রাতগুলি ভরিয়ে রেখেছিল। এই সময়কালের মধ্যে বাদল সরকার বেশ কিছুটা সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগেই করেছি। একদিকে নিজের দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতি এবং সারা বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর সংকট বাদল সরকারকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। অনিবার্যভাবেই তার প্রভাব পড়েছে এই সময়ের লেখা বেশকিছু নাটকে। তাই সেখানে কৌতুক নয়, কৌতুকের পরিবর্তে উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক সংঘাত আর সেই সংঘাতে পিষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকট-কথা। অবশ্য শুধু বাদল সরকারের নাটকই নয়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে ষাট-সত্তরের দশকের বাংলা নাটকে কমবেশি এই প্রবণতাগুলি মুখ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকের বিষয় বিন্যাস সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বপন মজুমদার যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''বিষয়গত ভাবে বিচার করলে এই পর্বের নাটকে অন্তত পাঁচটি প্রধান বিষয়— পর্যায় লক্ষ করব আমরা : (ক) স্বাধীনতা-দেশবিভাগ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িকতা; (খ) সামাজিক অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনা ও মধ্যবিত্ত জীবন; (গ) প্রান্তিক জীবন ও সামাজিক অনন্বয়; (ঘ) রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রচার এবং (ঙ) অস্তিত্বসংকটের নাটক।''[৫৫]

বাদল সরকারের এই পর্বে লেখা সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলিকে রাখা যেতে পারে শেষ বর্গে অর্থাৎ অস্তিত্ব সংকটের নাটক পর্যায়ে। প্রসঙ্গত আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বেশকিছু নাটকের কথাও বলতে পারি, যেগুলি মূলত এই ভাবধারার। স্বপন মজুমদারের মতে, ''এক বিপন্ন বিস্ময়, অস্তিত্বের সার্থকতা বিষয়ে সরল অথচ গভীর কিছু জিজ্ঞাসা এঁদের নাটককে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।''[৫৬] এই জিজ্ঞাসা

হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের। প্রশ্ন হলো কারা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি? এরা হল এমন একটি শ্রেণি যাঁদের জীবিকার জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চবিত্ত আর শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে অবস্থান করে। এরা কায়িক পরিশ্রমী শ্রেণির তুলনায় বেশি সামাজিক সম্মান পেয়ে থাকে, যদিও আর্থিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী মানুষের তুলনায় তাঁদের সামাজিক অবস্থান অনেকটা নিচে। নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে এঁরা। বেশি মাইনে চাকরি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সব রকমের সামাজিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। এরা যেমন তার রোজগার নিয়ে, তেমনি তার সামাজিক সম্মান এবং সামাজিক প্রভুত্ব বিষয়ে সচেতন। বাদল সরকারের এঁদের সম্পর্কে বলেছেন—

> ''বিভিন্ন নামে এঁদের পরিচিতি। ... এঁরা বুদ্ধিজীবী, যদিও বুদ্ধি জীবিকা হলে অনেকেই অনাহারে মরতো। এঁরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া চলে। এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে।''[৫৭]

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আশা এবং আশাভঙ্গ জনিত এক বিস্ময়কর অস্তিত্বের সংকটের কথা বারবার উঠে এসেছে এই পর্বে লেখা সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলিতে। যেন এক নতুন নাটককার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি এই পর্বে। এবার আমরা তাঁর এই সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলি আলোচনা সূত্রে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং একই সঙ্গে এই ধরনের নাটক রচনায় তাঁর সিদ্ধি কতখানি তারও একটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব।

বাদল সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাটক '**এবং ইন্দ্রজিৎ**'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩ সাল। কিন্তু নাটকটি লেখা শুরু হয় এরও বেশ কয়েক বছর আগে ১৯৫৭-৫৮ সালে লণ্ডন প্রবাসকালে। এই সময় বিদেশ বিভূঁইয়ে থাকা বাদল সরকারের মনে কতগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। লিখে চলেছেন ডায়রি চিঠি পত্র এবং কবিতার পর কবিতা। আর একদিন সেই লেখাগুলিই কখন নাটকের রূপ নিয়েছে বাদল সরকার নিজেও বুঝতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

> ''সে তো আর শুধু পাঁচ হাজার মাইলের ব্যবধান নয়, দূর থেকে বসে নিজের জীবনটাকে দেখা। কলকাতায় বসে নানা সমস্যার মধ্যে সেসব খুঁটিনাটি চিন্তা তো মাথায় আসা সম্ভব না। সেই চিন্তাগুলো আমার ডায়েরিতে প্রকাশ পেত। তখনই একটু কবিতা লেখার চেষ্টা। ... ওই চিন্তাগুলোই আসত কবিতায়। ১৯৫৭

থেকে '৫৯ আমি লণ্ডনে ছিলাম। ... 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর প্রথমাংশটা কিন্তু লেখা হয়ে গেছে '৫৭-'৫৮ সালেই।"[৫৮]

১৯৬৩ সালে লেখা সম্পন্ন হলেও 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী' পত্রিকার জুলাই, ১৯৬৫ সালের ২২তম সংখ্যায়। এর পরের ইতিহাস নাট্যমোদী সকলেরই জানা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, কানাড়া, তামিল এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত অভিনীত হয়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যায়। নাটকটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন প্রতিভা অগ্রবাল ১৯৬৮ সালে। ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে মাদ্রাজে, অনুবাদ পরিচালনা করেছেন নাট্যকার গিরিশ কারনাড। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা ল্যাণ্ডমার্ক নাটক হয়ে রয়েছে। সমসাময়িক নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তো বাদল সরকারকে নাট্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। বাদল সরকারের নাট্য জীবনে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

"... *এবং ইন্দ্রজিৎ* যখন পড়লাম, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। বিস্মিত হয়ে গেলাম যে একটা অন্য ধরনের নাটক এসে পড়ল, এবং আমরা সবাই জানি যে ওই একটা নাটকের পরেই বাদলদা সারা ভারতবর্ষের নাট্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে গেলেন।"[৫৯]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দেখলাম' বলেছেন না, 'পড়লাম' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ এই নাটকটি যে গভীরভাবে পড়বার নাটক তাও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে উঠে আসে। নাটক সাধারণত দৃশ্য শিল্প। এ ধারণার ব্যতিক্রম অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নাটক নিবিষ্ট পাঠক দাবি করে, বাদল সরকারের নাটক তা প্রমাণ করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে আরো দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের প্রকাশক অঞ্জলি বসু লিখেছেন—

" 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একটি ভালো অভিনয়যোগ্য নাটক, এইটুকুই এর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। অনেকেই মনে করেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ নাটক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নাটক পড়ার অভ্যেস বাংলাদেশে এখনও বিশেষ প্রচলিত নয়, যার ফলে নাটক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ হয়ে উঠতে পারে নি আজও। আশা করি, 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এই ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তনে অনেকখানি সাহায্য করতে পারবে।"[৬০]

আমরা নিবিষ্ট পঠনে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কে কীভাবে পাই? কী আছে এই নাটকে? এক্ষেত্রেও আমরা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ দিয়েই শুরু করতে পারি। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন—

> ''... মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্নের, মধ্যবিত্ত জীবনের অবসাদ, মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমি, এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের অন্বেষা, যেটা *এবং ইন্দ্রজিৎ*-এর মধ্যে দেখে গেছে— অমল-বিমল-কমলের মধ্য থেকে একজন ইন্দ্রজিৎ উঠে আসবার যে তৃষ্ণা, এর মধ্য দিয়ে— আমি মধ্যবিত্ত জীবনের মানুষ ছিলাম— সেই মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, গভীর বেদনাকে, গভীর স্বপ্নকে, গভীর আকাঙ্ক্ষা-আকুলতাকে এমন একটা আঙ্গিকের মধ্যে পেলাম, এমন একটা বিন্যাসের মধ্যে পেলাম, এবং এমন গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সংলাপের মধ্য দিয়ে সেটা পেলাম, যা আমাদের নাটকে এককথায় বলব, যে নতুন পথ খুলে দিল বলা যেতে পারে।''[৬১]

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নির্দিষ্ট কোনো প্লট নেই। জোর করে কাহিনি বানানোর চেষ্টা না করাই ভালো। লেখক একটা নাটক লিখতে চাইছেন তার অন্বেষণ চলছে। বাদল সরকারের এ অন্বেষণ চলে নিভৃতে। যাদের কথা জানেন না তাদের জানতে চান। সেই জানার ইচ্ছা এবং ভাবনাগুলো একটা কবিতার আকারে লিখে রাখেন। তারপর তাঁর ভাবনাগুলোকে একটা আকার দেন এবং তা 'প্রাইভেট পিস অব্ রাইটিং'[৬২] বলে মনে করেন। সে কারণে নিবিষ্ট সংযুক্তি এখানে লেখকের। অমল লেখককে জিজ্ঞেস করে— ''প্লট কী? লেখকের উত্তর— 'প্লট নেই'।''[৬৩] কী থীম রয়েছে এ নাটকে? বিমলের সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে লেখক জানাল— 'থীম? এই— আমরা!'[৬৪] 'আমরা' অর্থাৎ গড়পরতা মানুষ আর ব্যতিক্রমী মানুষ। জানা মানুষ আর না জানা মানুষ। এদের কাহিনিও গড়পরতা। কোন নাটকীয়তা নেই। আর ব্যতিক্রমী ও না জানা মানুষদের লেখক জানেন না, কিন্তু অন্বেষণ করেন। তাদের ভেতর থেকে নির্মিত হবে নাটক, এ ভাবনা কাজ করে। অমল-বিমল-কমলদের মধ্যে তাই অন্বেষণ করেন, এবং নির্মলকে ব্যতিক্রমী মনে হয় বলে তিনি জোর করে বলে বসেন তার নাম নির্মল নয়। আর তখনই বেড়িয়ে আসে গড্ডালিকা প্রবাহের এক জড়সর্ব্বস্ব সমাজের কথা, তাসের দেশের মতো যে দেশে গড়পরতা মধ্যবিত্ত মানুষ থাকে, তার কথা—

> ''লেখক ।। .....
>
> কী নাম আপনার?
>
> চতুর্থ দর্শক।। ইন্দ্রজিৎ রায়।
>
> লেখক ।। তবে কেন নির্মল বলছিলেন?

ইন্দ্রজিৎ ।। ভয়।

লেখক ।। কিসের ভয়?

ইন্দ্রজিৎ ।। অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি।

লেখক ।। চিরকাল কি নির্মল নাম বলে এসেছেন?

ইন্দ্রজিৎ ।। না। আজ বলি। এখন বলি।

লেখক ।। কেন?

ইন্দ্রজিৎ ।। বয়স হয়েছে। বয়স আনন্দকে ভয় করে। সুখকে ভয় করে। স্বস্তি চায়। শান্তি চায়। ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল দরকার এখন।

লেখক ।। কত বয়স?

ইন্দ্রজিৎ ।। একশো। দু'শো। জানি না কতো। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁয়ত্রিশ।"[৬৫]

আসলে এতো সমাজের বয়স, নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে স্থবিরতার ডাইমেনশন এতে উঠে এসেছে। নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র মানসীও তা থেকে বেরুতে চায় না। ইন্দ্রজিৎকে নিয়মের কথা বলে তাকে বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ সে স্থবির সমাজের নিয়ম মেনে চলে। এখান থেকে উঠে আসে আরেকটি ভিন্ন ডাইমেনশন তা হলো গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনের অর্থহীন অনুবর্তন। কোন কিছু না জেনে না ভেবে না বুঝে কোন জীবন দর্শন নির্মাণ না করে সেই এক গণ্ডিতে কাটানো মানুষ। নাটকে ইন্দ্রজিৎ বলে—

> "এই যে চলছে— তার কোনো মানে নেই? একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি—"[৬৬]

ঘর থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে চাকরি। বিয়ে-সন্তান সংসার সব মিলিয়ে একটা ঘূর্ণায়মান জীবন। ইন্দ্রজিৎ-এর মতো লেখকও এই ঘূর্ণায়মান জীবনের কথা বলেন—

> "অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে। তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ফেলে কমল চাকরি করে। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ... খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো অণু পরমাণু সব যোগ করে নগরদোলার পরম আবর্তন।"[৬৭]

অর্থাৎ এক স্থবির-গতানুগতিক জীবনই যেন ভবিতব্য। এজন্যই ইন্দ্রজিৎ বলেছিল তার বয়স একশো দুশো কত ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। এদের কোন বিবর্তন নেই। মধ্যবিত্ত এই সমাজের

পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> ''১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার বর্তমান লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের পরিচিতি। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। ... এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এঁরা অমল বিমল কমল। ...''[৬৮]

এভাবে নাটকে মধ্যবিত্তের বিন্যাস তুলে ধরা হয়। সেই সাথে সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা, ইতিহাস ও জীবনদর্শনের নানা মাত্রাও তুলে ধরা হয়—

''বিমল ।। Poetry, in a general sense, may be defined to be the expression of the imagination. .....

কমল ।। তাতে ক্ষতি কী? সাহিত্যে পলিটিক্স থাকবেই। না থেকে পারে না।

অমল ।। মোটেই না। সাহিত্য হবে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতীক। পলিটিক্সের মতো নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিমল ।। নোংরা কথাটায় আমার আপত্তি আছে। ... সাহিত্য হবে জীবনের ছবি—রিয়েলস্টিক্! ইন্দ্র কী বলিস?

ইন্দ্রজিৎ ।। আমি ঠিক বুঝি না। রিয়েলস্টিক্ হবে এটা মানি। কিন্তু নিছক জীবনের ফটোগ্রাফ্ হবে সেটাও— ''[৬৯]

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য যে কী হবে— তা নাটকের ভেতরকার ডাইমেনশনই বুঝিয়ে দেয়। রাজনীতি আসে অনিবার্যভাবে। বিভিন্ন সিস্টেমের বা মতবাদের প্রসঙ্গ উঠে আসে অমল-বিমল-কমলদের সংক্ষিপ্ত সংলাপে। যেমন অমলের বক্তব্যে উঠে আসে ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থার কথা—

''অমল ।। ক্যাপিটালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতেই হবে।

বিমল ।। ফ্যাসিজ্‌ম্ পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

কমল ।। কম্যুনিজ্‌ম্ মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে লুপ্ত করে।''[৭০]

অর্থাৎ প্রতিটি মতবাদের ফলাফল এক একটি ক্ষুদ্র সংলাপে তুলে ধরেছেন লেখক তা থেকে গণতন্ত্রও বাদ যায়নি। অমলের কণ্ঠে নাটককার বলেন 'ডেমোক্র্যাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় না'[৭১] এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান 'সাধারণ মানুষ সব সিস্টেমেই ভুগবে।'[৭২] রাজনীতি বিষয়টি নোংরা বলেই এদের অভিমত। একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা হয়েছে রাজনৈতিক মতবাদগুলি। আসলে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার মূল্যায়ন করতে এখানে তিনি ছাড়েননি।

জীবনের সঙ্গে কালের এক অদ্ভুত সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে এ নাটকে। কাল চলছে তার গতিতে আমরা যেন সেই কালের একটা অংশে দাঁড়িয়ে। তার সামনেও যা পেছনেও তাই। অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপক অর্থহীনতা। কোথাও কোনো উত্তরণ নেই, প্রাপ্তি নেই বা সফল হওয়ার সমাপ্তি নেই বা এসবের আশাও নেই—

> ''লেখক ।। ... আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি—পেছনে যা ছিল, সামনেও তাই।''[৭৩]

যদিও এ সমস্ত কিছু একটা নেতিবাচকতার ইঙ্গিত দেয় তবুও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় তার মধ্যে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে একজন ইন্দ্রজিৎ— অন্বেষণ লেখকের কাজ। মানুষ জানুক স্বপ্ন দেখুক, পরিবর্তিত হোক এই আশা রয়েছে নাটকের অভ্যন্তরে। নাটকে অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণা রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কথাও বাদল সরকার তুলে ধরেছেন। আমরা যদি তাঁর সেই সময়কার লেখা ডায়েরি বা চিঠিপত্র দেখি, তাহলে দেখব যে, একটা হতাশা-নিরাশার যন্ত্রণার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন বাদল সরকার। ২৪.০৩.৫৯ তারিখে তাঁর বোন মনুকে লেখা একটি চিঠি তিনি লিখেছেন—

> ''Camus-এর মতো আমার এখনো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নি, তাই আজও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো মাঝে মাঝে অযৌক্তিক অবাধ্য আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চোখ ফেরাই। তবু তাতে মনে হয়— বেঁচে আছি, বেঁচে থাকাটা দরকার, এবং —কে বলতে পারে?— হয় তো ভালোও।''[৭৪]

বাদল সরকার সবসময় আশার কথা বলেছেন। জীবনের কথা বলেছেন মানুষের বেঁচে থাকার কামনা করেছেন, মরণকে বরণের পক্ষে তিনি ছিলেন না। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের লেখক এই কারণে হয়তো সমস্ত নেতির মধ্যেও স্বপ্ন দেখেন। '... ঘুম ভাঙলেও স্বপ্নের জেদ ফুরোতে চায় না!'[৭৫] তীর্থ না হলেও শেষ পর্যন্ত তীর্থ পথের কথা বলা হয়েছে নাটকে। যথেষ্ট আসার ইঙ্গিত দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। নাটকের শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তার প্রমাণ—

> ''বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু'হাতে
> তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
> দিবসান্তে আজ যেন মন
> নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
> তীর্থপথ আমাদের— মনে যেন রয়।''[৭৬]

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নামকরণ বড় অদ্ভুত। এই নামকরণে নাটকের থিম ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের ভেতর থেকে উঠে আসে। তবে এমনটাও কিন্তু নয় যে এই নামকরণে কেবল ইন্দ্রজিৎ-কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'এবং' কথাটি মাত্রাবহ। 'এবং' এই শব্দ দিয়ে কোন কিছু শুরু হতে পারে না। 'এবং' অব্যয়টি পূর্বের কিছু কথা দাবি করে। এখন প্রশ্ন হলো ইন্দ্রজিতের পূর্বে তবে কে? তাদের কোনো উল্লেখ কি এর মধ্যে বোঝা যায়? অঞ্জলি বসু প্রকাশিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের যে প্রচ্ছদের উপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নামটি নাটকের পুস্তকে শোভিত হয় সেখানে কিন্তু ইন্দ্রজিতের পূর্বে রয়েছে আরও তিনজন যা কিনা অগণনের মাত্রাবাহী। আমরা তিনটি বিষয়ে কোন নাম বা অন্য কিছু উল্লেখ করে বলি ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয় সংখ্যাটি অনির্দিষ্টতার সূচক। তবে কি ইন্দ্রজিতের পূর্বে রয়েছে অসংজ্ঞাত সংখ্যা যাকে অঙ্কের ভাষায় বলে Infinite? এরা কারা? এক্ষেত্রে আমরা বিমলের বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি—

বিমল ।। ইন্দ্রকেই হিরো করে ফেলো। আমাদের মরা সৈনিক করে রোখো।"[৭৭]

লেখককে বিমল নিজেদের মরা সৈনিক বলে পরিচয় দেয়। তবে কি সেই মরা সৈনিকদের মধ্যে যে জীবন্ত মানুষ সে-ই ইন্দ্রজিৎ? সেকারণে 'এবং' অব্যয়ের সংযুক্তি! অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ এককভাবে অস্তিত্বহীন। তার স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই অন্য সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে অমল-বিমল-কমলদের সারিবদ্ধ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের ভাবনা ছিল 'অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ ও মানসী'[৭৮] অমল বলে— 'এ তো মলাটে কুলোবে না হে!'[৭৯] এখানে মলাট কথাটি একটি ব্যঞ্জনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে নামানুসারে সংখ্যাতীত ভাবকে বোঝাচ্ছে। আবার ওই অগণন মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। 'মরা সৈনিক' কথাটি এক্ষেত্রে বেশ মানানসই শব্দবন্ধ। সৈনিক একটি নামবাচক শব্দ নয়। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বোঝায় না। এটি একটি সমষ্টিবাচক শব্দ। এই শব্দটি একটাই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সৈনিকের কাজ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, রক্ষক হিসেবে কাজ করা। মরা সৈনিক মানেই পরাজিত। যে সৈনিক নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। লড়াই করে বাঁচতে পারেনি। জ্যান্ত সৈনিক সে-ই যে লড়াই বেঁচেছে অথবা রক্ষা করার জন্য লড়ছে। এখানেই 'মরা সৈনিক' শব্দবন্ধটি একটি আশ্চর্য কৌণিক মাত্রা পেয়ে যায়। একদিকে একই জাতীয় অগণন সংখ্যার প্রতীক হয় আবার জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানে মৃত্যুর নামান্তর নয়। সৈনিক অতন্দ্র প্রহরী। জীবনকে পাহারা দেবে মানুষের চৈতন্য নামক সৈনিক। সে সমস্ত রকম মৃত্যু ঠেকাবে। আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সে জীবন্ত করে রাখবে মানুষকে। সেই তো আসল নায়ক। সে কারণে বিমল ইন্দ্রজিৎকে হিরো করতে বলেছে। 'হিরো' শব্দটিও সেই সংগ্রামে জয়ের অভিনন্দিত ধ্বনি। ইন্দ্রজিৎ সেই হিরো। কীভাবে? অমল-বিমল-কমলদের মত অসংখ্য মানুষের সাপেক্ষে ইন্দ্রজিৎ হিরো, অগণন পরাজিত

মানুষের ভেতরে দাঁড়িয়ে সে জীবনের জন্য লড়াই করেছে, জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে বেঁচে থাকার নয় টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বিবর্তনহীন অমল-বিমল-কমলদের মতো জ্যান্ত-মরা মানুষেরা অনাটকীয়। তাদের ভূমিকা বোধ হয় আলোর মহিমাকে উজ্জ্বল করার জন্য অন্ধকার হয়ে থাকে। তাই তাদের নাটকে আনতেই হয় নইলে ইন্দ্রজিতের পূর্বে 'এবং' অব্যয়টি আসে না। গুরুত্বহীন গুরুত্বের জন্য এদের প্রয়োজন। লেখক তার নাটকে বিমলদেব নিতে চাইলে বিমল বলেছে— 'আমাদের আর টানা কেন বাবা? আমরা তো কাটা সৈনিক।'[৮০] এখানে মৃত্যুর কথা না বলে বিমল নিজেদের বলেছে কাটা সৈনিক। অর্থাৎ মৃত নয় কিন্তু বাঁচার তালিকা থেকে নাম কাটা হয়েছে। ফলে 'মরা সৈনিক' এবং 'কাটা সৈনিক' দুটিই তাৎপর্যবাহী শব্দবন্ধ। আবার নাম প্রসঙ্গে কমল বলে— 'হ্যাঁ, তার চেয়ে রাখো— ইন্দ্রজিৎ ও মানসী'।[৮১] কিন্তু এ নাম সেই ভালোবাসার মিষ্টি গল্প ভরা নাটকের নাম হয়ে যায়। নায়ক-নায়িকা সর্বস্ব নাটক। এরকম নাম থাকলে অমলরা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সমস্ত প্রতীকী তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা হারায়। এ নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে বাদল সরকার লেখককে দিয়ে বলেছেন—

> ''ইন্দ্রজিৎ আর মানসীকে নিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে বহু নাটক লিখিত হয়েছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, মিলনান্ত, বিয়োগান্ত। ... সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ইন্দ্রজিৎরা আর মানসীরা এসেছে, ভালোবেসেছে। কত আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, ঈর্ষা-অভিমান, কত জটিল মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এদের নাটক গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ আর মানসীর প্রেম। একটি চিরন্তন নাটকীয় উপাদান।— ইন্দ্রজিৎ!''[৮২]

না, এরকম চিরন্তন নাটকীয় উপাদান নাটককারের অভীষ্ট নয়, তাই ওই সংলাপের শেষে ইন্দ্রজিৎ-এর পর একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন। ইন্দ্রজিৎ কি তাই? তার নামপদটি তা বলে না। আবার ওই সংলাপে যত ধরনের নাটকের নাম উল্লেখিত রয়েছে সেরকম নাটক রচনাও উদ্দেশ্য নয়। এখানে গতানুগতিক কোন নাটক রচনার উদ্দেশ্য নয় বলেই গতানুগতিকতাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ফলত এ নাটকের নাম 'ইন্দ্রজিৎ ও মানসী' হতে পারে না। আবার মানসী যে উল্লিখিত হতে পারে না তার আরও কারণ আছে। যে অর্থে 'এবং' অব্যয়টি এসেছে শেষ পর্যন্ত মানসীও তো সেই দলে পড়ে। সেও তো নিয়ম নামক এক অদ্ভুত বিষয়ের দাস। ইন্দ্রজিৎ জানতে চায় কোথায় নিয়ম লেখা আছে। মানসী উত্তর দেয়— 'লেখা আবার কোথায় থাকবে? তাই নিয়ম।'[৮৩] অলিখিত এক অদ্ভুত নিয়মের ও সংস্কারের বন্ধনে সে আবদ্ধ। সেও গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত। ফলে মানসীও ওই 'এবং' এর দলে। সে কারণে অমলের ছেলে অমল, বিমলের ছেলে বিমলের মতই মানসী সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ

বলে: ''তাই হয় দুনিয়ায়। কতো মানসী আসে। আবার চলে যায়। ... মানসীর বোন মানসী। মানসীর বন্ধু মানসী। মানসীর মেয়ে মানসী।''[৮৪] সে কারণে মানসী নামের সংযুক্তি এ নাটকের নামকরণে আসতে পারে না। আমরা এবার দেখে নিতে চাই ইন্দ্রজিৎ কেন হিরো? নাটকে অনেক সময় আমরা দেখি বারবার সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কখনো ব্যর্থ জীবনের জন্য মরণ কামনা করেছে তার মনে হয়েছে মৃত্যুই পরম সুখের। নিজের প্রতি কখনো কখনো সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে ভেবেছে—

> ''আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের। কতো লোক মরে সুখে আছে। ... এখনই মরি না কেন?
>
> ... মানুষের বাঁচতে হলে বিশ্বাস দরকার। ভগবানের বিশ্বাস। ... মানুষে বিশ্বাস। বিপ্লবে বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। ভালবাসায় বিশ্বাস। এর মধ্যে কোন বিশ্বাসটা আজ আমার আছে বলে বলতে পারি?''[৮৫]

এরকম নেতিবাচক চিন্তা থেকে আমাদের মনে হয় ইন্দ্রজিৎ এক জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈনিক। কিন্তু সত্যি কি তাই? আসলে জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কথা বললেও ইন্দ্রজিৎ অনেক বেশি জীবনের প্রতি আশাবাদী।

> ''মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়লেও জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ নয়। জীবনকে গভীরভাবেই সে উপভোগ করতে চায়। জীবন থেকে সে পালিয়ে যায়নি। ইন্দ্রজিৎ জানে জীবন মহামূল্যবান জীবন।''[৮৬]

যে প্রচ্ছদটির কথা এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র একজন এই বৃত্তের অর্থাৎ গণ্ডির বাইরে পা রাখতে চেষ্টা করেছে।

এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু।

প্রচ্ছদটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পা সে বৃত্তের বাইরে রেখেছে এবং তার গতি বেরিয়ে যাওয়ার। সেরকম একটা গতির ভাব কিন্তু ঐ বাড়ানো পায়ের ছবিতে আছে। এ যে ইন্দ্রজিৎ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইন্দ্রজিৎ নিজের আইডেন্টিটি খোঁজে। তার মধ্যে বেড়া ভাঙার খেলায় মেতে ওঠা শক্তি আছে। মাঝে মাঝে সেও নির্মল হয়ে থাকতে চায় স্বস্তির জন্য। কিন্তু পারে না। ইন্দ্রজিৎ প্রচলিত পথ থেকে সরতে চায়, মধ্যবিত্ত নির্মিত গণ্ডির বাইরে বেরোতে চায়। নিয়ম কেন মানতে হবে এটাই তার প্রশ্ন। বরং নিয়ম ভাঙবে সে। যে নিয়ম অর্থহীন, যে নিয়ম মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটায়, মানুষের অবনমন ঘটায় সে নিয়ম সে ভাঙবে। ইন্দ্রজিতের লড়াইটা তাই অনেক ব্যাপক। এ বিষয়ে মানসীর সঙ্গে তার কথোপকথনটি উদ্ধৃতিযোগ্য—

''ইন্দ্রজিৎ ।। সবই তো মানছি। কিন্তু নিয়ম মানাটাই উচিত এ কথাটাও কি মানতে হবে?

...

মানসী ।। কী করতে চাও তুমি?

ইন্দ্রজিৎ ।। জানি না। দড়িটাকে ছিঁড়তে চাই। চারিপাশে এই যে বদ্ধ কানা দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে চাই।

মানসী।। কার সঙ্গে তোমার লড়াই?

ইন্দ্রজিৎ ।। দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ঐ যাকে সমাজ বলো— সেইটার সঙ্গে, তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে।''[৮৭]

এখানেই ইন্দ্রজিৎ স্বতন্ত্র। অমল-বিমল-কমলের মতো মানুষেরা নিয়ম খুঁটিয়ে দেখে। তা মানা উচিত কিনা, সে নিয়ে ভাবেও না, চলতে হয় চলতে থাকে। নিয়মের গণ্ডিতেই থাকে। আর ইন্দ্রজিৎ ওদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে চায়। সমাজের ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। কারণ ইন্দ্রজিৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে। ইন্দ্রজিৎ তাই বলেছে—

''যদি জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেতাম—তোমাদের এই নিয়মের সমাজে স্বর্গবাস করতে পারতাম। এখন আর দেওয়ালে মাথা না খুঁড়ে উপায় নেই।''[৮৮]

ফলে চিন্তা চেতনা ও দর্শন নিয়ে ইন্দ্রজিৎ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' হয়ে যায়। আবার ওই লড়াইয়ের তীব্র মানসিকতাই হয়তো তাকে পৌরাণিক ইন্দ্রজিৎ নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় কিন্তু এই নাটকের ইন্দ্রজিৎ দেবতা নয় মানুষ। নাটককার চরিত্রটিকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করেননি। আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আকাঙ্ক্ষা পূরণে নৈরাশ্য নিয়ে সে মানুষ। তাই সমাজ,সভ্যতা, রাজনীতি, মানুষ দেখতে

দেখতে অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। অস্তিবাদী চেতনায় আক্রান্ত হয় সিসিফাসের কথা বলে। কি করবে যেন ভেবে পায়না—

> ''দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়ায় তোলে। যেই চুড়োয় পৌঁছায়, আবার গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার তোলে।''[৮৯]

আসলে মানুষ ইন্দ্রজিৎ কখনো কখনো যন্ত্রণায়, হতাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেও আবার নির্মল হয়ে যেতে চায়, সাধারণ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার তো সে উপায় নেই। জীবনের পথে তাকে তো চলতেই হবে। সে সাধারণ হলেও তার সেই অমল কমলদের সারিতে চলার উপায় নেই। লেখক বলেন—

> ''তবু তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার নির্মল হবার আর উপায় নেই।''[৯০]

এখানেই সাধারণ সারির সঙ্গে সংযুক্তি এবং বিযুক্তি আর সেজন্যই তো নামকরণ 'এবং ইন্দ্রজিৎ' শুধু 'ইন্দ্রজিৎ' নয়।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নির্মাণশৈলীর অন্যতম বিষয় হল কবিতা। নাটকে সংলাপের বিকল্পে কবিতা বা কবিতায় সংলাপ, এ নাটকের প্রাণ বলা যেতে পারে। বাদল সরকার লণ্ডনে থাকার সময় বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। যা প্রকাশের জন্য নয়, ভাবনাকে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য। পরে ওই কবিতাগুলো সাহায্য করেছে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক রচনায়। বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''... ওই কবিতাগুলোই সাহায্য করেছে আমাকে-কবিতাগুলো লেখবার সময়ে যে ধরনের চিন্তাভাবনা মাথায় ছিল সেগুলো আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে।''[৯১]

বাদল সরকার কবিতার মতো করেই ভেবেছেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ'কে। কবিতার মতো করে সংলাপ মিশ্রিত একটা ব্যক্তিগত রচনা হিসেবেই 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর আত্মপ্রকাশ। কবিতার ভাব নিয়ে কবিতার মেজাজ ও শৈলী নিয়ে নাটক হয় কিনা তা নিয়ে অবশ্য স্বয়ং বাদল সরকারের মনেই সংশয় ছিল। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> ''কতগুলো কথা তো ভেতরে বলবার থাকে, সেগুলো নাটকে বলা যায় কিনা এ প্রশ্নটা উঠেছে। বলা যায় না বলেই বিশ্বাসটা ছিল।''[৯২]

তথাপি বাদল সরকার একটা চেষ্টা করলেন এবং বলেছেন সে চেষ্টাটাও '... একটা ডাইরির মতনই'।[৯৩]

কীভাবে কবিতা এই নাটকের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে তা বাদল সরকারের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—

> ''...ওটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে যেন একটা অংশ পর্যন্ত লিখে তারপরে হয়তো একটা কবিতা সামনে রয়েছে, চার বছর-পাঁচ বছর আগের লেখা এই কবিতাটিতে পৌঁছাব সুতরাং মাঝখানের লেখাগুলো যেন ওই পরের কবিতায় পৌঁছানোর জন্য লেখা।''[৯৪]

ফলে কবিতার আলোচনা ছাড়া যে এই নাটকের আলোচনা অসম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন অঙ্কের এই নাটকে প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি এবং তৃতীয় অঙ্কে এ তিনটি, মোট এগারোটি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি কবিতা লেখক চরিত্রের উচ্চারণ। ১৯৫৭ সালে লণ্ডন প্রবাসকালে ২১.১২.৫৭ তে লেখা প্রথম কবিতা 'তীর্থপথ' সম্পাদিত রূপে এখানে নাটকের শেষে স্থান পেয়েছে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের কাহিনিটি ভাব এবং দর্শন নির্ভর। তার প্রকাশ ভঙ্গিটিও আবার আত্মগত। ফলে কবিতা এখানে আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ডাইমেনশন আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি ইতিমধ্যে, তার অনেকগুলোই কবিতার ভেতর উদ্ভাসিত।

প্রথম অঙ্কেই আমরা জীবনের একঘেঁয়ে অনুবর্তনের ভাবদ্যোতক কবিতা পাই। লেখক যাদের নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করছেন, দেখলেন সেই অমল-বিমল-কমলদের নিয়ে একটা অংক বা ধারাপাতের সংখ্যায় পাওয়া যায়, নাটক লেখা যায় না। এক্ষেত্রে একটি কবিতা দিয়েই এই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক একটা কবিতা লিখেছেন বলায় কমল শুনতে চেয়েছে এবং বলেছে 'যদি বুঝতে পারি— ছিঁড়ে ফেলো। না পারলে মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিও।'[৯৫]

প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে এ বুঝি আধুনিক কবিতার প্রতি ব্যঙ্গ। আসলে তা নয়। এ হল জীবনের আঙ্গিক হিসাবে কবিতার মত বস্তুর না প্রবেশের কথা। কবিতাটি কেবল সংখ্যার আবর্তন—

> ''এক—দুই—তিন
> এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন
> চার—পাঁচ—ছয় ...''[৯৬]

এভাবেই নির্মিত। অসংখ্য মানুষ এভাবেই সংখ্যা হয়ে থাকে যা অমল-কমল ইঙ্গিত করে। আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের কথা। সেখানেও মানুষগুলোকে সংখ্যা বা নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ আঙ্গিক ক্রমের ভাষাময় উত্তর মেলে পরের কবিতাটিতে—

''ছন্দবাঁধনে আবর্তনের চলুক অনাদি খেলা,
আলো আঁধারির চক্রধাঁধায় কালের শোণিতধ্বনি
.....
কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুনে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?''[৯৭]

গতানুগতিক আবর্তনের চক্র এ জীবন। সময়ের তালে জীবনের স্পন্দন বাঁধা। জীবনকে এভাবে দেখলে কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু পুরো অংকটা তবে অস্বীকার করা হয়। পুরো অংকের উত্তর যেন শূন্য। কেননা কোন আবর্তনে কিছু বিশেষ মাত্রা নেই। আমরা শূন্য উত্তর চাই না, তাই ক্ষুদ্রতার গণ্ডি টানি। নাটকের লেখক তাই কবিতায় বলে—

''নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্র রাশিতে ভারি করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবশূন্য— সে কথা যায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডী টানা।।''[৯৮]

এরপরেই শুরু হয় একঘেয়ে জীবনের কথা, চাকরি সংসার আবার পড়া স্কুল-কলেজ আবার চাকরি। এরা বিমলের ছেলে বিমল, কমলের ছেলে কমল। নাটককার এই ছকবাঁধা জীবনকেই ভাঙতে চান। আর সে কারণেই তাঁর ইন্দ্রজিৎ অন্বেষণ ।প্রথম অংকের তৃতীয় কবিতায় তাই বলা হয়েছে—

''আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা
অজ্ঞ বাতাস চেতনার বিষে মেশা,
.....
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।।[৯৯]

জীবন তো খণ্ডিত। সেই খণ্ড জীবনের উপর বসে পূর্ণতার কথা ভাবা, কিংবা খণ্ডতাকে আঘাত করার কথা ভাবা যে হাস্যকর লেখক তা জানেন। তবুও তাঁর ভাবনায় পূর্ণতাময় হাতছানি দেয়। কিসের জন্য অন্তরের এই চাওয়া? লেখক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। নাটকের দ্বিতীয় অংকের প্রথম কবিতায় তাই লেখক বলেছে—

''এ মাটি পুরোনো। রিক্ত আকাশ।
বৃথা পরিকল্পনা।
আমি। বসে ভাবি। আজো ভাবি।

আজো কেন তবু ভাবি পুরো মানুষের কথা?
অংশ-চেতনা আজো কেন খোঁজে লিখনের অন্যথা।”[১০০]

সবার ভাবনা তো এক হয় না। সবাই এভাবে ভাবেও না। তারা কেবল চলতে হয় তাই চলে। না ভেবেই নিয়ম রক্ষা করে চলে। কেন? কি? এমন কোনও প্রশ্ন তাদের ভাবনায় না। তারা নিজেরাও নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়ায় না। একটা গড্ডালিকা প্রবাহে তাদের দিন চলে যায়। তাদের কোনো আত্মদ্বন্দ্ব নেই। বাদল সরকার তথা লেখক চরিত্র সে কথা তুলে আনেন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় কবিতায়—

‘‘এই পেয়ে গেছি! সব্বাই করছে।
কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?
দাঁত কটি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?
কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তোলে হাই?
সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!”[১০১]

আঙ্গিকটি অনেকটা সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এর মত। লেখক তথা নাটককার আর হয়তো এরকম জীবনকে ‘আবোল তাবোল’ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে জীবনের অর্থান্বেষণে ব্যাপৃত। মহাপৃথিবীর সাপেক্ষে সে হয়তো ক্ষুদ্র, মহাকালের প্রেক্ষিতে সে হয়তো তুচ্ছ, তবুও তার থেমে থাকলে চলে না, তাকে চলতেই হবে—

‘‘সৌরমণ্ডলের চক্রে পৃথিবীর নগণ্য ঠিকানা
কোথায় হারিয়ে আছে।
.....
ধরণীর অর্থহীন প্রাণ।
সে অনন্ত গণনাতে
আমি আছি সংজ্ঞাহীন সামান্য কণাতে।”[১০২]

তবুও—

‘‘প্রাণের উদ্ধত অধিকারে
অনন্ত ঘোষণা রাখি কণিকার মুহূর্তপ্রচারে।”[১০৩]

এই ঘোষণা আসলে জীবনের জয়গান। এখানেই জীবনের অর্থময় হয়ে ওঠা। আর এ কারণেই সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার পরেও লেখক আত্মগত ভাবোচ্ছাসের কবিতায় বলেন—

‘‘ঐ মাঠে। ঐ ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নিচে।

ও মাঠে মাটিতে ঘাসে মেশা
অনেক পুরোনো নেশা
.....
ও মাঠে তরল দিন বহুদিন বহু কথা বোনা।
.....
কথা তো পুরোনো হয়ে যায়,
একই কথা ঘুরে ফিরে আসে।
তুমি চলো মাটি-মাখা ঘাসে
আজে বাজে দু'টো কথা রাখি,
দু'দণ্ড বসে থাকি
কাছাকাছি গোলাপী বাতাসে।"[১০৪]

চলমানতাই জীবন। চলমান জীবনের ভেতর থেকেই জীবনকে পাওয়া যায়। এই কবিতায় সেই ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। এটা ঠিক যে লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ কখনো কখনো বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। জীবনের চলমানতার পাশাপাশি এক বিপন্ন বিস্ময়ের কথা উঠে আসে। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম কবিতায় লেখককে বলতে শোনা যায়—

''কী হবে কথার রাশি দিয়ে?
কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে?
আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়,
আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায়
ছায়ার গভীরে।"[১০৫]

জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার নায়কের মতো 'এক বিপন্ন বিস্ময়' লেখককে তাড়িত করে। 'সকল লোকের মাঝে থেকেও' সে একা। এই একই একাকীত্বের যন্ত্রণা এখানে উঠে আসে বাদল সরকার তথা লেখকের উক্ত কবিতায়। পূর্বের ঐ শপথ ও জীবনান্বেষণের তীব্রতা তারপর এমন কবিতা আমাদের অবাক করে। তাহলে কি লেখক কিংবা ইন্দ্রজিৎ মানুষের আশ্চর্য সব দেখে ক্লান্ত! তৃতীয় অঙ্কের প্রথম কবিতায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

''জোলো সান্ত্বনার বুলি ছেড়ে দাও,
.....
মানুষ আশ্চর্যতম প্রাণী;

ডুবো পাথরের ভিতে পাতালে সে পাতে রাজধানী।”[১০৬]

এই ধরনের নেতিবাচক ভাবনা আমাদের হতাশ করে। যে উদ্দীপ্ত ভাব আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি সবই আবার হতাশায় ডুবে যায়। ইন্দ্রজিৎকে বলতে শোনা যায়—

‘‘এ প্রবাসে সবই মিথ্যে হোলো।”[১০৭]

এই জাতীয় ভাবনা কবিতা পরম্পরায় এসে হঠাৎ আমাদের ধাক্কা মারে। তবে আশার বিষয় এই ভাবনা ক্ষণিক মূহূর্তের। কারণ ইন্দ্রজিৎ জানে, লেখক জানে, ‘‘আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে।”[১০৮]

কিন্তু ‘তবু ঠেলতে হবে’। [১০৯] তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতাতে তারই প্রকাশ দেখি। জীবনের পথ চলার গতি পায়। যে গতি পূর্বে ছিল, যে ভাবনা পূর্বে ছিল, তা পুনরায় ফিরে আসে ইন্দ্রজিতের চেতনায়—

‘‘আমি আছি। বেঁচে আছি। জেগে আছি।
মনে আছে সব। আরো তো জীবন আছে বাকি।”[১১০]

সুতরাং চলতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। আশা-নিরাশা সব নিয়েই চলতে হবে। সিসিফাস-এর মত অস্তিবাদী চেতনায় আক্রান্ত হলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা চৈতন্যকে জাগ্রত রাখতে হবে। এভাবেই একটা স্বতন্ত্র জীবনদর্শন বোনা হয়ে যায় নাটকের শেষ কবিতায়—

‘‘বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু’হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।”[১১১]

বলাবাহুল্য এই কবিতায় পৌঁছেই নাটকের সমাপ্তি।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এই পর্বে লিখিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক হলো **‘সারারাত্তির’**। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ লেখার পরেই বাদল সরকারের দ্বিতীয় প্রবাস জীবন। আবার সেই শূন্যতা। ২৪.০৭.৬৩ লেখা ডায়রিতে বাদল সরকার লিখছেন: ‘‘সেই শূন্যতা। অতীতের কিছুই মনে পড়ছে না। ভবিষ্যতের কিছুই মাথায় আসছে না। ...।”[১১২] এই সময় তিনি ফ্রান্সে। আর এই ফ্রান্সে বাসকালে লিখলেন ‘সারারাত্তির’ নাটক। নাটকের রচনাকাল ১৯৬৩। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, ডায়েরিতে লিখছেন—

‘‘সারারাত্তির’ শেষ করলাম এইমাত্র। রাত পৌনে বারোটা এখন। ভালো লাগছে। শুতে যাচ্ছি।”[১১৩]

এই নাটক একটা ঘোরের মধ্যে লেখা। এই নাটক লেখার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একটা অদ্ভুত রকম অনুভূতি বাদল সরকারের মনে কাজ করে। ১৭ই আগস্ট ১৯৬৩, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু

কিছু মনে পড়ছে। তিনি লিখছেন—

> ''রাত্রের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে এতোক্ষণে বিস্তৃতির স্রোতে ভেসে যেতো। জাগা মন উপহাস করতো স্বপ্ন-দেখা মনকে। উপহাস করতো— যদি মনে পড়তো।... দুপুর কেটে আসছে।... স্বপ্নটা হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক কথা বলবো ভেবেছিলাম, বলা হোলো না।''[১১৪]

আবার পরের দিন ১৮ই আগস্ট লিখছেন—

> ''যখনই লেখার কথা ভাবছি, যখনই লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি, ইন্দ্রজিৎ এসে বাধা দিচ্ছে। আর যেন বড়োপিসীমা, রাম শ্যাম যদু সম্ভব নয়। অথচ ইন্দ্রজিৎ তোর বার বার হয় না। তবে কি ফুরিয়ে গেলো? ইন্দ্রজিতের পরে আর কী আছে?''[১১৫]

অর্থাৎ এই লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাদল সরকার নাটক লেখার উপযুক্ত বিষয়ে খুঁজছেন। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে তিনি 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মতো আর একটি বিষয় খুঁজছেন, কিন্তু লিখতে পারছেন না। এই করে করে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর অবশেষে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি নাটকের বিষয় খুঁজে পেলেন। কী নিয়ে 'সারারাত্তির' নাটক সে সম্পর্কে বাদল সরকারের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, তিনি লিখেছেন—

> ''দীপকরা রোজ যেতে বলে। কেন? কেন যাবো? ওরা রাগ করবে? ওরা কিছু মনে করবে? কী আসে যায়? আমার আর সময় কোথায়? আমি যে আটত্রিশ। কোথা থেকে শুরু করবো? গোড়া থেকে? ধৈর্য্য নেই। সময় নেই। তুলে নেবো ইতিহাস? ডুবে যাবো কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ কয়েকটি ব্যক্তিতে, তুলে নিয়ে আসবো ছাঁকা একটি অভিজ্ঞতা?
>
> শূন্য ঘর। আধা অন্ধকার ঘর। বাইরে ঝড়। বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ। কিন্তু ঘরে স্তব্ধতা, ঘরের স্থিরতা অবিচলিত। অব্যবহৃত ঘর। কাঠের বড়ো বড়ো তক্তা আড়ভাবে রাখা। লোহালক্কড়। প্যাকিং বাক্স। গুদাম? না, গুদাম নয়। কিছুই সাজানো নেই। তবু একটা সংহতি। তবু কোথায় যেন প্রাণের আভাস। কোনো একটা প্রাণ বেঁচে আছে, বাস করছে এই সংহত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। কোনো একটা অস্তিত্বের গৃহকোণ এটা। একান্ত নিজস্ব গৃহকোণ।
>
> ওরা বাইরের। এ ঘরে ওদের অনধিকার প্রবেশ। দুর্যোগের কবল থেকে পালাতে গিয়ে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষণিকের জন্য। ভঙ্গ করেছে এ ঘরের

একান্ত নিজস্বতা। বাইরের কলরব, বাইরের ক্ষুদ্র বিবেচনা আলোচনা, বাইরের কর্মব্যস্ত অকিঞ্চিৎকর জীবন নিয়ে এসেছে এই জগৎছাড়া নির্জন সংসারে। ওরা কথা বলছে। ওরা নালিশ জানাচ্ছে ঘটনার দুর্গতিতে। ওরা মাথা ঘামাচ্ছে বহু ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে। ওরা কলহ করছে— অবান্তর কলহ। ওরা ভালোবাসছে— প্রাত্যহিক ভালোবাসা।

ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওরা নর-নারী। এই জগতের। বাইরের জগতের। এই ঘরের নয়। এ ঘর বাইরের ঘর নয়। এ ঘর ভিতরের।"[১১৬]

বলাবাহুল্য, এই 'ভেতরের ঘর'ই 'সারারাত্তির' নাটকের ঘর এবং তার ব্যাখ্যা বাদল সরকার নিজেই দিয়েছেন। এই ভাবনা বাদল সরকারকে তাড়িত করে এ নাটক লিখতে। ২রা সেপ্টেম্বর লেখা শুরু করলেন আর শেষ হল ৮ই সেপ্টেম্বর। কী আছে এই নাটকে?

'সারারাত্তির' আমাদের বেশ কিছু ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। নাটকটিতে স্বাভাবিকধর্মিতার সঙ্গে অদ্ভুতধর্মিতাকে মেলানো হয়েছে। জনবসতি থেকে দূরে এক নির্জনতায় অবস্থিত একটি পোড়ো বাড়িতে নিয়ে যান দু'জন বাইরের নারী-পুরুষকে। স্ত্রী পুরুষ এবং বৃদ্ধ এই নামেই চরিত্রের নাম। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর মতো বা তার থেকেও বেশি ব্যঞ্জনাবহ প্রতীকী চরিত্র। এদের চরিত্র বলা যাবে কিনা সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কে বৃদ্ধ? সে কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তো বাইরের কেউ নয়। ভেতরের ঘরে তার বাস! অভিজ্ঞতার ফলে 'বৃদ্ধ'। সে জেগে থাকে সারারাত। এই জাগ্রত চৈতন্যই আমাদের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী 'সারারাত্তির'-এর খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা এখানে তা উল্লেখ করতে পারি—

"রাতের অন্ধকারে আমরা প্রত্যেকেই এমন এক একটা নির্জন ঘরে বাস করি। সেই সময়েই আমাদের চৈতন্য জেগে ওঠে। ভিতর-ঘরে বাসা বেঁধে থাকা জ্ঞাত-অজ্ঞাত সব কিছু উঠে এসে দ্বন্দ্ব বাধায় ভিতর ও বাইরের ঘরে। এই দ্বন্দ্বের আবহে বাইরের প্রকৃতির দুর্যোগ যেন আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।"[১১৭]

এখানে বাইরের দুর্যোগের সঙ্গে মানবচরিত্রের অবচেতন স্তরের দ্বন্দ্বময় সংঘাতকে নাটককার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন।

নাটকে দেখা যায় স্ত্রী আর পুরুষের কথাবার্তায় একা থাকার কথা উঠলে তার প্রতিধ্বনিতে বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। "... একা, একা, একা।"[১১৮] এরকম একটা ধ্বনি বৃদ্ধ যখন করতে থাকে চমকে উঠে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রটি। একা থাকার ভয়ে তারা শিহরিত হয়ে উঠে। একাকিত্ব যেন গ্রাস

করে। প্রত্যেক মানুষই 'সকল লোকের মাঝে বসে'[১১৯] একাকিত্বের এই ভাবনা উঠে আসে স্ত্রী-পুরুষ ও বৃদ্ধের ভাবনায়—

পুরুষ ।। আপনি—একা থাকেন এখানে?

বৃদ্ধ ।। আপনি কথাটা ভুলতে পারছেন না দেখছি।

পুরুষ ।। না, মানে, এখানে, এরকমভাবে—

বৃদ্ধ ।। কেন থাকি, এই তো?

স্ত্রী ।। আচ্ছা, কেন বারবার জিজ্ঞেস করছো? ওঁর হয়তো বলতে আপত্তি আছে। (বৃদ্ধ আবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন।)

বৃদ্ধ ।। না, বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সব কথা সহজে বলে বোঝানো যায় না।

স্ত্রী ।। কেন যাবে না?

বৃদ্ধ ।। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি— আপনি কেন একা থাকেন? বলে বোঝাতে পারবেন?"[১২০]

সত্যি এরকম প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। একটা নাড়া দেওয়ার মত প্রশ্ন। ফলে এ প্রসঙ্গ এখানেই থেমে যায়। কিন্তু এর পরেই নাটককার অন্যভাবে জীবনের নিগূঢ় জিজ্ঞাসায় ফিরে এসেছেন। নাটকে দেখা যায় বৃদ্ধের একটা অদ্ভুত থিওরি। এই থিওরির মূলে আছে একটা ম্যাজিক সংখ্যা। এই ম্যাজিক সংখ্যাটি হল সাত। তার যুক্তি হলো সাতের গুণিতক বয়সগুলো জীবনের এক একটা মাইলস্টোন। যেখানে একটা পুরনো চেতনার শেষ হয় এবং নতুন চেতনার আরম্ভ হয় অর্থাৎ বয়সের এক একটা সন্ধিস্থান—

''বৃদ্ধ ।। ... সাত বছর সম্বন্ধে আমার একটা থিওরী আছে। আমার মনে হয়, সাত-বছরটা মানুষের জীবনের একটা একক। একটা ইউনিট, বা মডিউল, বা মাপকাঠি— যা বলেন। সাত এক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ, চার সাত্তে আঠাশ, পাঁচ সাত্তে পঁয়ত্রিশ—বয়সগুলো কল্পনা করুন? সাত, চোদ্দ, একুশ, আঠাশ, পঁয়ত্রিশ, বিয়াল্লিশ। বয়সের এক-একটা সন্ধিক্ষণ। একটা পুরনো চেতনার শেষ। নতুন চেতনার আরম্ভ।"[১২১]

ওই একদিনের ঝড়ের রাতে এই ম্যাজিক সংখ্যা দিয়েই বেরিয়ে আসে স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র দুটির সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস। বৃদ্ধের সামগ্রিকভাবে নিজেকে উপস্থাপনই হলো এ নাটকের নিগূঢ়তার বার্তাবাহী। স্ত্রী যেন সেই অপ্রকাশ্য নিগূঢ়তার টান অনুভব করে আর পৃথক হয়ে যায়।

সাত বছরের বিবাহিত জীবনের স্বামী তার ধাত বুঝতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধ জানে আটাশ বছরের মেয়েরা কি করে—

> ''মেয়েদের বয়স আন্দাজ করতে নেই। নইলে বলতাম—যে বয়সে মেয়েরা সমস্ত পুরোনো জীবনটা খতিয়ে হিসেব করতে বসে— আপনার সেই বয়স।''[১২২]

স্ত্রী এ সত্য উদ্ঘাটনে বিস্মিত হয়। বৃদ্ধ আরো অনেক কিছু জানে-সারারাত জেগে থেকে জেনেছে। সেই জানাগুলো এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। যেমন তাস খেলা নিয়ে স্ত্রী যা বেছে নিয়েছে তা সব তাসের মাঝে রাখলেও পাওয়া যায় না আর। বৃদ্ধ এখানে বেছে নেওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন—

> ''স্ত্রী ।। তাসটা বার করবেন না, বা?
>
> .....
>
> বৃদ্ধ ।। ... আপনি বেছে নিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে?''[১২৩]

বৃদ্ধের বক্তব্য থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি জীবন একটা তাসের মতো। যেখানে অনেক কিছুই মেলানো যায় না। অনেক কিছু না পাওয়া থেকে যায়। সেই না পাওয়াকে শেষ পর্যন্ত যদি পেতে হয়, তখন তা দোমড়ানো-মোচড়ানো হরতনের বিবির মতোই হয়:

> '' বৃদ্ধ : (পুরুষের দিকে তাকিয়ে) ফিরে না পেলে আপনার শান্তি হচ্ছে না?
>
> পুরুষ : তা না হলে তো শেষ হয় না খেলাটা?
>
> বৃদ্ধ : শেষ একটা চাই?
>
> পুরুষ : নিশ্চয়ই?
>
> বৃদ্ধ : সে যেমনই শেষ হোক? যদি তাসটা ফিরিয়ে দিই দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেৎলে চটকে— তবু শেষ চাই?''[১২৪]

এখানে হরতনের বিবি, 'দোমড়ানো', 'মোচড়ানো'-এ সব কিছু জীবনের নিগূঢ় চেতনার সংকেতবাহী। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর সার্বিক জীবন জিজ্ঞাসা 'সারারাত্তির'তে গাঢ়তর জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

এই নাটকে একটি নাম প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সেটা রঞ্জন। স্ত্রী তার ভালোবাসার মানুষ রঞ্জন এর সঙ্গে বৃদ্ধের সাদৃশ্য পায়। বৃদ্ধ জানায় রঞ্জন তার উত্তর পরুষ। বৃদ্ধ রাত জেগে জেনেছে সব। একদিকে বৃদ্ধের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে রঞ্জনের প্রেম, যৌবন—ওই উভয়ের মিলনে গড়ে

ওঠা 'আনন্দ' আর 'শান্তির' কথা বলে স্ত্রী। তবে এই আনন্দ তার স্বপ্নে বোনা। কিন্তু ট্র্যাজিক ব্যাপার হল আনন্দ আর শান্তি একসঙ্গে হয় না। নিরুদ্বেগের, শান্তির জীবনে স্ত্রী আনন্দ পায়নি! রঞ্জনের ব্যাপ্তিতে সে আনন্দ। রঞ্জন কে? স্ত্রীর কাছে রঞ্জন এক অখণ্ড আকাশ, এক ব্যাপ্তি, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই অনুষঙ্গে কোথাও যেন রবীন্দ্রনাথের নন্দিনীর রঞ্জনের কথা মনে পড়ে যায়। সেও তো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল। এই নাটকের স্ত্রী চরিত্রটি তার রঞ্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—

> ''আমি যে রঞ্জনকে দেখি। সে রঞ্জন আকাশ, মাটি তাকে বাঁধতে পারে না। সে রঞ্জন বাতাস, স্পর্শ পাই, কিন্তু ধরতে পারি না। রঞ্জন এক ব্যাপ্তি। তার দু'চোখ চলে যায় মাটি পেরিয়ে, পৃথিবী পেরিয়ে, প্রতিদিনের মুহূর্তদের পেরিয়ে, দিগন্তের ওপারে। তার চোখে বিশ্ব, অনেক বড়ো বিশ্ব, এত বড়ো যে সে আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটিতে ধরা পড়ে না।''[১২৫]

আবার বৃদ্ধ রঞ্জনকে ব্যাখ্যা করে বলেছে—

> ''... রঞ্জনের চোখে বিশ্ব, রঞ্জনের চোখে জ্বালা, আর রঞ্জনের মনে স্বপ্ন। রঞ্জনের চোখ, আর রঞ্জনের মন। চোখ যা দেখেছে, মন তা দেখতে চায়নি। চোখ যা মেনেছে, মন তা চিৎকার করে অস্বীকার করতে চেয়েছে। রঞ্জনের মন স্বপ্ন বুনেছে। দিনের পর দিন পরম যত্নে পরম ধৈর্য্যে স্বপ্ন বুনেছে। আর রঞ্জনের চোখ ছুরির ফলা হয়ে একদিনে সে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার, দু'বার, বার বার। রঞ্জনের রক্তাক্ত মন প্রতিবার নতুন করে আবার বুনেছে স্বপ্নের জাল। জানে ছিঁড়ে যাবে। জানে থাকবে না। চেনে তার পরম শত্রু দু'টো চোখের ধারালো নির্মমতাকে। তবু এক নির্বোধ তাগিদে বারবার বুনে গেছে সেই একই স্বপ্নের জাল।''[১২৬]

আমরা আগেই জেনেছি স্ত্রীর রঞ্জন বৃদ্ধেরই উত্তরপুরুষ। ফলে বৃদ্ধ-রঞ্জন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। স্ত্রী-রঞ্জন এবং বৃদ্ধ-রঞ্জন মিলেই এক পূর্ণরূপ।

এ নাটকে নাটককার বাদল সরকার আমাদের এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন। যারা বেঁচে থাকতে চায় এবং আনন্দ চায় তারা কেউ শান্তি বিঘ্নিত হোক এটা চায় না। কিন্তু আনন্দ আর শান্তি একসঙ্গে পাওয়া সোনার পাথর বাটির মতো। একমাত্র পূর্ণ মানবের পক্ষে হয়তো এ দুটো একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব। ক'জন আর রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত্যুর মালায় জীবনের অমৃত গান গাইতে পারেন! নাটককার সঙ্গতভাবেই একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, তাহলে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষ, কবিতা ভালোবাসা মানুষ, স্বপ্ন দেখা মানুষ কোনটা বেছে নেবে? আনন্দ বেছে নিতে

গেলে প্রতিদিনকার সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়বে যন্ত্রণায়। অভ্যাসের জীবন নিয়ে দীর্ণ যন্ত্রণায় বেঁচে থাকতে হবে স্বপ্ন বুনে। বৃদ্ধের জীবনে যেমন ঘটেছে। নাটকের বৃদ্ধ সবচেয়ে বেশি করে জীবনের এই স্বপ্ন জাল বুনে গেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রাত্যহিক ক্লান্তি আর শুধু দিন যাপনের গ্লানি দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তার শান্তি দেখানো হয়েছে বৃদ্ধের আচরণের প্রেক্ষিতে। সেই প্রেক্ষাপটেই বৃদ্ধের অতীত জীবনরেখা ফুটে ওঠে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার মানুষটির মতো তার সবই ছিল, তা কেন ও কীভাবে আজ শূন্য হলো তার অসম্ভব বিশ্লেষণ রয়েছে নাটকে। আর পরিশেষে স্ত্রী চরিত্রের সঙ্গে তার শেষ অবধি সম্পর্ক, তার স্বপ্নের বুননের ফসল এবং এখানে এসেই জীবনের কাব্য যেন পূর্ণ হলো। কবিতায় যাপিত জীবন মানে ছন্দে সুরে ও আনন্দে হিল্লোলিত হওয়া। বাদল সরকার এখানে অসম্ভব মুন্সিয়ানায় জীবনের সঙ্গে কবিতা কিংবা কবিতার সঙ্গে জীবনের সেতু নির্মাণ করেছেন। একটা পূর্ণ কবিতা বুনতে চেয়েছেন বৃদ্ধ— যা হয়তো সব কিছুর মধ্য দিয়েই পূর্ণ আনন্দের দিকে নিয়ে যাবে। কবিতার এক একটা স্তবক বোনা হয়েছে এক একটা স্তরে। এ তো নিছক কবিতার স্তবক নয়, এ হল জীবনেরই এক একটা স্তর। ব্যক্তি মানুষকে জীবনের এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করতে হবে, বৃদ্ধেরই বলা সাত সংখ্যার স্তরের মতো। স্তবকের আকারে সাজালে স্তরগুলি দেখে নিতে পারবো আমরা। প্রথমত জানার স্তর, জানার মধ্যে যন্ত্রণার স্তর— প্রথম দৃশ্য এই দ্বিস্তরের বিন্যাস। অতীত বিন্যাস তৃতীয় স্তরে এবং তা নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় তথা শেষ দৃশ্য রয়েছে সমস্ত কিছু ভেতর দিয়েই অতিক্রম করে স্বপ্ন নির্মাণের ও তাকে বুকে গ্রহণ করে থাকার আনন্দ। নাটকে শেষ পর্যন্ত তা ঘোষিত হয়েছে—

> ''যা হবার হোক। সারারাত্তির
> তবু তো দু'চোখ সারারাত্তির
> মনের স্বপ্ন তবু তো দু' চোখ মেনেছে।
> শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
> অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।''[১২৭]

বাদল সরকারের সিরিয়াসধর্মী নাটকগুলির মধ্যে আর একটি অন্যতম নাটক হলো '**বাকি ইতিহাস**' নাটক। নাটকটি রচনাকাল ১৯৬৫ সাল। সময়টা বড় বিপজ্জনক। সাহিত্যে তখন অস্তিবাদী চেতনার আলোড়ন আর অন্যদিকে হাংরি আন্দোলনের এক দুর্মর দুর্জয় সাহসী রূপ। স্বাধীনতার স্বপ্ন তখন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছে। চেতনাধর্মী মানুষ, বোধ সম্পন্ন মানুষ, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সংকটে আবর্তিত মানুষ তখন

এক গভীর অসুখে ভুগছে। এই সময়চেতনার অন্যতম দলিল 'বাকি ইতিহাস'। কি আছে নাটকে? স্বামী শরদিন্দু আর তার স্ত্রী বাসন্তী-সাধারণ একটি মধ্যবিত্তের সংসার। ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া হয়নি, বাসন্তী শরদিন্দুকে তা মনে করিয়ে দেয়। ছুটির দিনে বেড়াতে গেলে কেমন হয়—এই ভাবনা থেকে রাস্তাঘাটে ভিড় ট্রামবাসের ঝক্কি সব উঠে আসে। গড়পরতা জীবনের চিত্র দিয়ে নাটকের শুরু। শরদিন্দু সাহিত্যের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। খানিকটা আত্মভোলা গোছের মানুষ শরদিন্দু। তার স্ত্রী বাসন্তী সাদাসিধে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ, কিন্তু অবসর সময়ে গল্প লেখো। আর বাসন্তীর গল্পের উপকরণ একেবারেই সাদামাটা। তার গল্প প্লট নির্ভর। তাই সে প্লট চায় স্বামী শরদিন্দুর কাছে।

বাসন্তী চায় সহজ গল্পের প্লট-নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের ছুটির সকালে এভাবেই গল্প লেখার প্লট খোঁজার তাগিদ শুরু হয়। বাসন্তী মিষ্টি মিষ্টি গল্পের একজন লেখক। আর শরদিন্দু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতে অভ্যস্ত। এভাবেই দাম্পত্য সুখ-চিত্রে যখন তারা পরস্পরকে মেলে ধরে তখন নিজেদেরই অজান্তে খবরের কাগজে হঠাৎ নজর পড়ে সীতানাথ চক্রবর্তীর 'উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা'র ঘটনা। সীতানাথ ও তার স্ত্রী কণার সঙ্গে বাসন্তী-শরদিন্দুর পরিচয় হয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে। সেই স্বল্পপরিচিত দম্পতির একজন সীতানাথের আত্মহত্যার খবর বাসন্তী-শরদিন্দু উভয়কেই বিস্মিত, চিন্তিত ও আলোড়িত করেছে। কেন সীতানাথ আত্মহত্যা করল?

শরদিন্দু বাসন্তীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে এই ঘটনা বা সংবাদের অনুষঙ্গ তৈরি করতে চান নাটককার। শরদিন্দু এই পরিচয় সূত্র ধরে অপরিচয়ের রহস্যকে কল্পনায় ভরিয়ে বাসন্তীকে গল্প লিখতে বলে। বাসন্তী কিন্তু এই আত্মহত্যা থেকে গল্পের প্লট নির্মাণ করে একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। সেই গল্পে তার মনের ভেতর ভালবাসার ভাঙন উঠে আসে, উঠে আসে গৃহস্থালির অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রত্যাশা। একজন ছা-পোষা গৃহিণী আর মিষ্টি গল্পের কারবারি হিসেবে বাসন্তী তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব জীবনযাপনের ভেতর থেকেই নির্মাণ করে সে গল্প। জীবনের চলমান ঘটনাকে আশ্রয় করে রবিবারের ছুটির দিনে নিজেদের গৃহস্থালির কথোপকথন ও ঘটনাক্রম দিয়েই শুরু হয় গল্প; কিন্তু আত্মহত্যা যখন পুরুষের, তখন সমাজ স্বভাবতই ভাবেই স্ত্রীর দোষের কথা এবং গড়পরতা ক্ষেত্রে সমাজ একটা বিষয়কেই ভাবে, তা হল নারী-পুরুষ সম্পর্ক। বিশেষভাবে এরকম ঘটনায় খোঁজা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা সমাজের থাকে। এ এক অদ্ভুত সমাজ-মনস্কতা। আর সেই ভাবেই বাসন্তী গল্প নির্মাণ করে। তৈরি হতে থাকে বাসন্তীর চোখে সীতানাথ-কণার গল্প। মঞ্চে শুরু হয় সীতানাথ-কণার কাহিনি নিয়ে নাটক। সীতানাথের ভূমিকায় শরদিন্দু এবং কণার ভূমিকায় বাসন্তী। স্বামী-স্ত্রী শরদিন্দু-বাসন্তীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত

হতে থাকে ঘটনা, তৈরি হতে থাকে নাটক।

বাসন্তীর গল্পে যথারীতি সীতানাথ-কণার দাম্পত্য জীবনে উঠে আসে তৃতীয় ব্যক্তি নিখিল। স্বামীর বন্ধু নিখিলের সঙ্গে কণার একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও কণা স্বামী সংসার এসবকেই প্রাধান্য দেয়। দুজনের কথোপকথনেই এমনটাই উঠে আসে—

''নিখিল : সেদিন যা বলেছি ভুলে যেতে পারো না? (কণা চুপ) আবার আগের মতো সব কিছু হয় না? (কণা চুপ) জানি না তোমাকে কী করে বিশ্বাস করাবো— আমি সেদিন যা বলেছি, তা মনেপ্রাণে—

কণা : ও কথা থাক।''[১২৮]

সেকথা থেকেই যায়। বলা হয় না। ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মত্যাগের যে মহতি ভাবনা আমরা সচরাচর দেখি বাসন্তী তাকেই তার গল্পে ব্যবহার করে। নিখিলের শেষ বিনয়ী প্রত্যাশা যেন ভিক্ষা চায়—

''নিখিল: ... শুধু একটা কথা দাও। যদি জীবনে কোনোদিন—কোনোসময়ে—সত্যিকারের প্রয়োজন বোধ কোরো, আমাকে জানাবে (কণা নীরব)''[১২৯]

.....

এর উত্তরে কণা বলে—

''কথা দিচ্ছি, কোনোদিন দরকার হলে জানাবো।''[১৩০]

উপন্যাস হলে হয়তো দুজনের এই সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হত। কিন্তু এ নাটকে সেই পরিসর নেই। এছাড়া কণা-নিখিলের সম্পর্ক মূল বিষয় নয়। তবে কণাকে এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে সমাজে নারীর অসহায়ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নারীর অসহায়ত্ব এবং আরো কিছু কৌণিক মাত্রা উঠে আসে কণার সংলাপে। কণার নিজের বাড়ির এত শখ কেন সীতানাথের এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—

> ''নিজের বলতে একটা জিনিস কখনো পাইনি। ঘর তো দূরের কথা, শাড়ি, জামা—কিচ্ছু না। নিজের বলতে একটা চিরুনি পর্যন্ত ছিল না। তিন বোনে সব কিছু ভাগ। সব কিছু! ক'টাই বা জিনিস ছিল? একটা ফাটা আয়না— ঐ আয়নাটা ভেঙে আমি নাকি খুব মার খেয়েছিলাম। আমার মনে নেই, আমার শুধু ফাটাধরা আয়নাটা মনে আছে। বড়দির কাছে শুনেছি। বড়দি মরে গেলো শ্বশুরবাড়িতে মার খেয়ে আর গাধাখাটুনি খেটে। মা কাঁদত। আর কাশতো। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতো। মা মরে গেলো। চিকিৎসার ভানটাও হোলো না। বড়দি মরে গেল। মেজদি তো— ''[১৩১]

নিখিলের কাছে কণা আশ্রয় খোঁজে। সীতানাথ এই সম্পর্কের পাকে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এই হলো বাসন্তীর গল্প।

সীতানাথ-কণার জীবনের না জানা ইতিহাস যা অন্যদের কাছে 'বাকি ইতিহাস' তা নাটকীয় ভাবে বর্ণিত হয় বাসন্তীর গল্পে। কিন্তু গল্পের ভিতর নাটকীয়তা শরদিন্দুর পছন্দ হয়নি। অধ্যাপক প্রাবন্ধিক শরদিন্দু তার মতো করে ভেবেছে সীতানাথের আত্মহত্যার পেছনের ইতিহাস। শরদিন্দু যাপিত জীবনের দর্শিত ইতিহাস ছেড়ে মন ও মনের গহীন আঁধারে ঢুকে পড়ে। খুঁড়তে থাকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ইতিহাস। আদিম মানবের বন্য জৈব-যৌন চেতনাবাহী সভ্য মানবের ইতিহাস। নাটককার যেন এক গল্পকথক। চম্বলগড়ের গহনারণ্যে নিয়ে যান মনান্ধকারের বীজ উপ্ত করতে। মধ্যভারতের এক জঙ্গল চম্বলগড়। যেখানে স্থান ও কালাতিক্রম করে ভ্লাদিমির নবোকভ-এর 'লোলিটা' আসতে পারে। পার্বতী আসে। দশ এগারো বছরের মেয়ে পার্বতীর স্পর্শে সীতানাথের গহণ জীবাণু জেগে ওঠে—

> "... লোলিটা। পার্বতী। কণা জানে না। কণা জানে না—ঐ ডাকাত আমিও হতে পারতাম। হওয়া সম্ভব ছিল।
>
> ...
>
> দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। একটা বিষাক্ত জীবাণু মনের মধ্যে হাজার হাজার, লাখ লাখ হয়ে উঠেছে। সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে বিষ দিয়ে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। প্রাণপণে লড়াই করেছি। পালিয়ে আসতে চেয়েছি। পারিনি। ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছি। মেরেছি! কিন্তু কী যে হয়ে গেলো! কেন মেরেছিলাম? কেন ও জঙ্গলে গেলো? কেন? কেন?"[১৩২]

মারের আঘাতে সুতীব্র অভিমানে পার্বতী হারিয়ে গেল অরণ্যের অন্ধকারে। খুনি ডাকাতেরা যেখানে লুকিয়ে থাকে। যেমন দেহের অন্ধকারে থাকে সেই 'অদস্' পরিচালিত জৈব জীবাণু মুক্তি পেলেই খুন করে আমাদের উপরকার ভদ্রতার আবরণ বা পলেস্তারা— তেমনি খুনে ডাকাতেরা সম্ভোগ করে অরণ্যের ভয়ানক অন্ধকারে, আর খুন হয় পবিত্র পার্বতী, মাত্র দশ-এগারোর পার্বতী, কুমারী নারী পার্বতী। পার্বতীর এই পরিণতির জন্য সীতানাথ নিজস্ব অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। বারবার ভুলতে চায় সেই চম্বলগড়ের ঘটনা। কিন্তু ভুলতে পারে না। স্কুলের সম্পাদক বিধুভূষণবাবুর নাতনি নাবালিকা গৌরী তার কাছে আসে পার্বতীর বেশে। সহকর্মী বিজয়ের কাছে সীতানাথের স্বীকারোক্তি—

''... শত অন্যায় সত্ত্বেও কণা আমাকে ত্যাগ করেনি। কণা ছিল। কিন্তু—কিন্তু বিজয়, পার্বতী আবার ফিরে এসেছে।

...

... প্রথমে আমি টের পাইনি, সাবধান হইনি। যখন টের পেলাম— তখন আর উপায় নেই। সেই বিষ আবার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে তুলেছে। বিজয়, আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না! অশোককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, বিধুবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছি— কিন্তু বিষ মরছে না। পার্বতী ফিরে আসছে বিজয়। পার্বতী ফিরে এসেছে!''[১৩৩]

নিজের ভিতরে উপস্থিত 'বিষ'ই ক্লাসে নাবোকোভের 'লোলিটা' পড়ার অপরাধে ফাস্টবয় অশোককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি সীতানাথের বন্ধু বিজয় অনুধাবন করতে পেরে বলে—

''লোলিটার লেখককে হাতে পেলে ও ফাঁসি দিতো। না পেয়ে অশোকেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে, কারো বারণ না শুনে। আসলে লোলিটাদের ওপর, পার্বতীদের ওপর যারা অন্যায় করে— তাদের প্রতি সীতানাথের অস্বাভাবিক রকম তীব্র ঘৃণা। এতোটা তীব্র হোতো না, যদি না পার্বতীর দুর্ঘটনার জন্যে ও নিজেকে দায়ী করতো।''[১৩৪]

অপরাধী মনের এ এক অদ্ভুত বিপরীত শৃঙ্খলা। সীতানাথের নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণা এসেছে। আট বছরের মেয়ে গৌরীর প্রতি আবার নতুন করে দুর্মর টান অনুভব করেছে সীতানাথ। অথচ তার সুপার ইগো তাকে সর্বদা বাধা দিয়ে চলেছে। ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে সীতানাথ। সমস্ত অপরাধবোধ নিয়ে সীতানাথ তাই আত্মহত্যা করে। কিন্তু সীতানাথের যত আলোড়ন তো মনের ভেতর। সীতানাথ তো মনোবিকলনের শিকার। মনোবিকলনই সীতানাথকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে। এভাবে শরদিন্দু সীতানাথের আত্মহত্যার আরেকটি ইতিহাস গড়ে তুলেছেন।

শরদিন্দু একজন সাহিত্যের অধ্যাপক, যিনি প্রয়োজনীয় মনোবিকলন জানেন। বিশেষ করে হাংরি আন্দোলনের সময়কালীন ওই অধ্যাপক শরদিন্দু ভেতর সময়ের প্রভাব পড়েছে। শরদিন্দু কোথাও যেন এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। আবার সম্পূর্ণ হয়ও না। বাসন্তীর ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে মিলে যায় কণার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্ট কণা সে না হয়ে তার কল্পনার এক সমাজবাস্তবের মেয়ে হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে সীতানাথের সঙ্গে শরদিন্দুর সংযুক্তি যেন একটু বেশিই। বাসন্তীর সঙ্গে শরদিন্দুর কথোপকথনের মাত্রা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করে। বাসন্তী জানে শরদিন্দুর গল্পটাও কল্পিত। কিন্তু শরদিন্দুর এতে আপত্তি। শরদিন্দুর ভাবনাটা

কেন সত্যি হবে না। এটা গল্প নয়। এভাবে তর্ক বিতর্ক করতে করতে শরদিন্দু-বাসন্তী ঢুকে যায় সীতানাথের আত্মহননের ভেতর। এত জোর দিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তার কথাগুলি যে শরদিন্দুর ভেতরকার রূপটাই চলে আসে। তবে কি শরদিন্দুর ভেতরেও এমন কোন সত্তা তাকে জ্বালায়। শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর কাছে ধমক খেয়ে যেন আত্মস্থ হয়।

> ''আমি বোধহয়— আমরা বোধহয় সীতানাথের আত্মহত্যা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি।''[১৩৫]

'আমি বোধহয়' শরদিন্দু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলেছে। সে দিক দিয়ে শরদিন্দুর সঙ্গে সীতানাথের সংযুক্তি বেশি। শরদিন্দু তাই বলেছে, '... সীতানাথের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বোধহয়।'[১৩৬] ফলে বাসন্তী ঘুমোতে গেলে শরদিন্দু সীতানাথের মুখোমুখি হয়। এক দুঃস্বপ্নের ঘোর। কেবল শরদিন্দু নয় আমাদেরও যেন চাবুক মারে এ দুঃস্বপ্ন। শরদিন্দু তখন আর সীতানাথের স্রষ্টা নয়। সীতানাথ অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। সীতানাথ যেন সেই মানুষ—জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার অভিশপ্ত নায়ক। যার 'মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়,... কোন এক বোধ কাজ করে!'[১৩৭] সেই বোধ তাকে বাঁচার অর্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত করেছিল। সেই বোধ থেকে সে সংগ্রহ করেছে 'মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস'[১৩৮] শরদিন্দুর যুক্তি ছিল এ আসলে মৃত্যুর ইতিহাস। কিন্তু 'মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়?'[১৩৯] সে কারণেই সীতানাথের কাছে মৃত্যুই জীবনের একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। সীতানাথ আত্মহত্যা করে।

এবার সীতানাথ মানুষের ইতিহাস তুলে ধরে শরদিন্দুর সামনে। না কোন ইতিহাস বইয়ের তথ্য সীতানাথ তুলে ধরেননি। সমস্ত ছবির কাটিং অনেকটা খবরের কাগজের কাটিং রাখার মত করে শরদিন্দুর সামনে তুলে ধরে। ছবির শুরু মহাভারতের ছবি দিয়ে, অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস, জীবনের ইতিহাসকে, মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে আজকের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসকে সীতানাথ শরদিন্দুর সামনে তুলে ধরে।

সত্যিটা হল মানুষের ইতিহাস অতীত কাল থেকেই শোষণ অত্যাচার আর হিংস্রতার নগ্ন ইতিহাস। মানুষের জীবনের ইতিহাস কেবলমাত্র মৃত্যুর কথা বলে, সেটা মহাভারতের কাল হোক আর বিশ শতকের এই সময় দাঁড়িয়েই হোক। ইতিহাস বিধৃত মানুষের অন্বেষক তথা জীবনের অন্বেষক সীতানাথ একেই বলে 'বাকি ইতিহাস'। যে ইতিহাস—

> ''চাকরি নয়। কণা নয়। বাসন্তী নয়। বাকি ইতিহাস!
> দাঙ্গার ইতিহাস! মহাযুদ্ধের ইতিহাস! রাশি রাশি বছরের হত্যা নির্যাতন যন্ত্রণার ইতিহাস! কুরু-পাণ্ডব সিকন্দর নীরো চেঙ্গিস খা নেপোলিয়ন হিটলারের

ইতিহাস। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলোসিয়মের বালিতে, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোশিমার পোড়া মাটিতে লেখা রয়েছে। হাজার হাজার বছরের বাকি ইতিহাস!"[১৪০]

সীতানাথ এই ইতিহাসের সামনে দাঁড় করায় শরদিন্দুকে, আর আমাদের নাটককার। শরদিন্দুর মতো আমরাও মুখোমুখি হই এক ইতিহাসের—মানুষের বাকি ইতিহাসের। অসহায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ শরদিন্দু যেন আমাদেরই প্রতিনিধি হয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে— 'কিন্তু তার আমি কী করতে পারি?'[১৪১] ইতিহাসের এই যন্ত্রণা আমাদের বহন করে চলতে হবে। মানবেতিহাসে অমানবিকতাই যেন ধ্রুব সত্য। আমরা সবাই যেন এক চেতনাহীন জনগোষ্ঠী অথবা বোধহীন এক পরাভূত। সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে অসহায় ভাবে ভাবি আমাদের কিছু করার নেই। সীতানাথ বলে—

"না। তুমি কিছু করতে পারো না। আমি কিছু করতে পারিনি। কারো কিছু করবার নেই। নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ— সব বিছুই চলবে, সব কিছু মানুষই করবে— তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু'বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এরা সবাই মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো। এরা সবাই জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।"[১৪২]

এই ভাবে বেঁচে থাকাকে সীতানাথ ঘৃণা করে। এইভাবে বাঁচার অর্থ হল একরকম বাঁচার ভান করা। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসের মতো এই আমাদের জীবনের ইতিহাসও মৃত্যুর? সীতানাথকে দিয়ে নাটককার কি সেটাই বলতে চান? প্রমাণ সীতানাথের সংলাপ—

"... তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।"[১৪৩]

সীতানাথ নিজের জীবন দিয়ে সেই জীবন্মৃত হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরে, যার সঙ্গে শরদিন্দু তথা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের জীবন মিলে যায়। জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা আর অর্থহীনতার কথা সীতানাথের সংলাপে উঠে আসে: 'রাশি রাশি বছরের অর্থহীনতার ইতিহাস। রাশি রাশি মানুষের, রাশি রাশি কীটের অর্থহীনতার ইতিহাস।'[১৪৪] সভ্যতার এই অর্থহীন ইতিহাস, জীবনের এই অর্থহীন ইতিহাস সম্বল করে মানুষ কী করবে? সীতানাথের মতো মানুষদের যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে— 'মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে!'[১৪৫] এ ক্ষেত্রে যেন যুক্তি, ক্রমে সিদ্ধান্তে

উপনীত হতে হয় যে মৃত্যুই একমাত্র সত্য। সমস্ত ভয়ানক ইতিহাসের ধারাকে আর অর্থহীন জীবনের টিকে থাকাকে বদলানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই আত্মহত্যাই মানুষের ভবিতব্য। সীতানাথ যেন এই যুক্তি দেখিয়ে শরদিন্দুকে প্রশ্ন করে 'তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?'[১৪৬] এই প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে 'কেন বাঁচতে চাই? বাঁচতে কে না চায়?'[১৪৭] হাজার হাজার বছর ধরে এই অভ্যাসে মানুষ বাঁচে। স্ত্রী-পুত্র সংসার প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে সেই অভ্যাসের জীবন। কিন্তু সীতানাথের কাছে এসব অর্থহীন। সেও জীবানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়কের মতো যেন এক বিপন্ন নায়ক। যার কাছে 'নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;/ অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—'[১৪৮], 'এক বিপন্ন বিস্ময়'[১৪৯] তার রক্তের মধ্যে খেলা করে। এই বিপন্ন বিস্ময়ে প্রোথিত হয় মানব সভ্যতার বাকি ইতিহাস।

অর্থহীনতার উপলব্ধি থেকে সীতানাথের আত্মহত্যা কিন্তু জীবন থেকে পলায়ন নয় বরং প্রবল জীবনতৃষ্ণার সুতীব্র আর্তিই-এর কারণ। এরকম এক আশ্চর্য জীবন জিজ্ঞাসা সামনে উপস্থিত করে সীতানাথ তথা নাটককার শরদিন্দুর মতো আমাদেরও চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়। শরদিন্দুর মতো ছাপোষা মানুষকে সীতানাথের ভাবনা তাড়িত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো টিকে থাকতে চায়, বেঁচে থাকার ভান করে লক্ষ লক্ষ মানুষের মত। তাই সে আত্মহত্যা করে না। বাঁচার যুক্তি হিসেবে সে দাঁড় করায় ইতিহাসের অন্য পিঠ—

> ''না, এ হয় না! এ হতে পারে না! ইতিহাসের আর একটা দিক আছে! যুদ্ধের ও পিঠে শান্তি আছে! নির্যাতনের ও পিঠে ভালোবাসা আছে। নিশ্চয়ই আছে! না হলে- না হলে তো সবাইকে আত্মহত্যা করতে হয়।''[১৫০]

শরদিন্দুর এই যুক্তি সীতানাথের কাছে আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। কারণ হিসেবে সীতানাথ বলেছে— 'জীবনের অর্থ ফুরোলে ভাবে একদিন অর্থ ফিরবে। বেঁচে থাকা শেষ হলে ভাবে— একদিন আবার শুরু হবে। তাদের আশা আছে।'[১৫১] সীতানাথের ইতিহাস চেতনায় ঐ আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শরদিন্দুর মতো মানুষের আশা আছে তার অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। এখানেই শরদিন্দু, সীতানাথ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বন্ধু বাসুদেবের আগমনে শরদিন্দু দুঃস্বপ্ন মুক্ত হয়ে ফিরে আসে আবার বাস্তবের জীবনে। উচ্ছ্বসিত হয় চাকরির প্রমোশনে। শরদিন্দুর মনে হয়েছে—

> ''চাকরি নিয়ে, প্রোমোশন নিয়ে— ক্ষ্যাপাই দরকার! এ ছাড়া বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই!''[১৫২]

এতক্ষণ ধরে যে সীতানাথের মধ্য দিয়ে যে যুক্তি ঘনিয়ে তুলছিলেন নাটককার আর হাজার হাজার

লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার ভানকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, সেখান থেকে শরদিন্দুর পৃথক হয়ে যাওয়া আমাদের খটকা লাগে বৈকি। কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে নাটকে শেষ পর্যন্ত শরদিন্দুর আশাকে তীব্রভাবে কষাঘাতই করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও। ফলে যারা মনে করেন এ নাটক শেষ পর্যন্ত আশার কথা শোনায়, সেটা আসলে একরকম আত্মপ্রবঞ্চনাই। আসলে শিল্পে শেষপর্যন্ত উত্তরণের একটা দিক খুঁজে বের করতেই হয়— তাই সীতানাথ থেকে শরদিন্দুকে পৃথক করার মধ্যে অনেকেই একটা ইতিবাচক দিক খোঁজার চেষ্টা করেন। এর একটাই কারণ আমরা প্রত্যেকেই অজান্তে সীতানাথকে এড়িয়ে শরদিন্দু হয়েই থাকতে চাই। নিজেদের প্রবঞ্চিত করে রাখতে চাই।

'বাকি ইতিহাস' এক অদ্ভুত ইতিহাস-বোধের নাটক। নাটকের নাম দেওয়া হয়েছে 'বাকি ইতিহাস'। এখানে স্বভাবতই সীতানাথের খাতায় সাঁটা ছবিগুলিকে ধরেই বাকি ইতিহাস ভাবা হয়। কিন্তু শুধু ওইটুকুই ইতিহাস হলে তো নাটকের প্রথম দুটি অঙ্কের প্রয়োজন হতো না। নাটককার কি কেবলমাত্র ঐ শেষ অঙ্কের ইতিহাস চেতনায় পৌঁছানোর জন্য অন্য দুটি অঙ্ক এনেছেন? কেবলমাত্র সহযোগী হিসেবে? বস্তুত নাটক পাঠে আমাদের তা মনে হয় না। শরদিন্দু আর বাসন্তী কিংবা সীতানাথ ও কণার—তাদের প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত বেঁচে থাকা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত জীবনের মূলত ছা-পোষা মানুষের জীবনের ইতিহাস যেমন এই নাটকে উঠে এসেছে, তেমনি ফ্রয়েড আবিষ্কৃত জৈবজীবন ও যৌন চেতনার ইতিহাস, বিকৃত যৌন ভাবনার ইতিহাস, সভ্যতার বীভৎস মারণ ইতিহাস, আর সবচেয়ে বেঁচে থাকার অর্থান্বেষণে 'বোধি' মানুষের যন্ত্রণার ইতিহাস-এইসব বহুমাত্রিক ইতিহাসের বোধ নিয়েই 'বাকি ইতিহাস'। নাট্য অভিনেতা, অধ্যাপক সৌমিত্র বসু 'বাকি ইতিহাস' নাটকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন—

> ''বাদল সরকার দুর্মর এই বেঁচে থাকার পেছনে ঝুলিয়ে দেন অত্যাচারের ইতিহাসের কালো পর্দা, কিন্তু জীবনের বহমানতাকে তা কোনোভাবে অস্বীকার করে না। তাকেই হয়তো আমরা বলতে পারি বাকি ইতিহাস, ইতিহাসের সমস্ত মৃত্যুমুখী আবর্তনের পরেও যা বাকি থেকে যায়।''[১৫৩]

এইসমস্ত মিলেই হয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, বাকি থেকে যায় জানতে কিংবা জানাতে। তাই ইতিহাস 'বাকি ইতিহাস', আমাদের পূর্ণাঙ্গ 'বাকি ইতিহাস'।

বাদল সরকারের পরের নাটক **'যদি আর একবার'**। নাটকটি রচনাকাল ১৯৬৬ সালের ২রা এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল। এই সময় তিনি চাকরিসূত্রে নাইজেরিয়ায়। সেখানে বসেই লিখলেন এই

নাটক। এই নাটকের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে জে.এম.ব্যারির 'ডিয়ার ব্রুটাস' নাটক। নাটকের মুখবন্ধে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''একটা ইংরেজি নাটক থেকে আরম্ভ করবার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কাহিনি,
> চরিত্র কবিতার ছন্দে লেখা সবই আমার নিজস্ব।''[১৫৪]

নাটককার নিজে নাটকটিকে একটি হাল্কা মেজাজের নাটক বললেও নাটকের অভ্যন্তরস্থ যে বিষয় পাই অর্থাৎ যে বিশেষ দিকটি এখানে আলেকিত করেন তা কিন্তু মোটেও হালকা নয়।

জীবনের চলমানতায় মানুষের যে বাঁচার অন্বেষণ এবং শেষ পর্যন্ত তা যে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হতে চায় না এমন কথাই এ নাটকের নাটককার তুলে ধরেছেন। নাটকের গল্প একসঙ্গে দুটো স্তরে এগোয়— লৌকিক আর অলৌকিক। বুড়ঢ়া জিন ও ছুট্‌কু জিনকে এনে অনেকটা অলৌকিকতার স্পর্শ দেন নাটককার। আর ওই অলৌকিক ম্যাজিকেই উদ্ঘাটিত হয় জীবনে না পাওয়া অপূর্ণ ইচ্ছেগুলো। বিষয়টি যথেষ্ট গম্ভীর। তবে নাটককার নাটকের চরিত্রগুলিকে বেশ একটা রোম্যান্টিক পরিবেশে রেখে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া দুই দম্পতি সঞ্জয়-অতসী এবং রতিকান্ত-করুণা নেপচুন হ্যাপি লজ নামে একটি হোটেলে ওঠে। ওই একই হোটেলে বনলতা নামে আর এক ভদ্রমহিলাও ওঠে। সঙ্গে রয়েছে হোটেলের ম্যানেজার সত্যসিন্ধু এবং চাকর ব্রজলাল। ভ্রমণের মেজাজে, এরকম একটি ভিন্ন পরিবেশে রেখে নাটককার একে একে চরিত্রগুলোর চাওয়া-পাওয়া, জীবনভাবনা ও যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। জীবনের এক সময়ে অতসী সঞ্জয়কে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন এই বিবাহিত জীবনে এক অতৃপ্তির হতাশায় ভোগে। সঞ্জয়ের প্রতি অতসীর আকর্ষণ থিতিয়ে আসে তার অর্থহীনতার কারণে। বিলাসিতাহীন জীবনে ক্লান্ত অতসী ভাবে—

> ''... সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা।
> জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব,
> ফেরবার উপায় তো নেই!''[১৫৫]

অন্যদিকে আবার বৈভব বিলাসে কাটানো রতিকান্ত ও করুণার জীবনে অন্যরকম অতৃপ্তি। তারা যেন এসবে হাঁপিয়ে ওঠে। করুণা অফিসার স্বামী নিয়েও সুখী নয়। অর্থ নয়, কীর্তি নয়— সুখে থাকার জন্য এসব যে যথেষ্ট নয় এটা করুণার কথায় স্পষ্ট হয়—

> ''রোজগার! টাকা! ভুলেও ভেবো না।
> টাকাতেই সমস্ত অভাব মিটে যায়।''[১৫৬]

করুণা চায় একটা নিরুদ্বেগ শান্তির জীবন আর বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে মুক্তি:

> ''... আমি শুধু চাই

যেটুকু বিদ্যে আছে সম্বল করে
কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
মুক্তি চাই শুধু। ...”[১৫৭]

অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা সচ্ছল রতিকান্ত সে অন্যরকম অতৃপ্তিতে ভোগেন। করুণার মতো সাধারণ রমণীতে রতিকান্ত তৃপ্ত হয় না। সে খোঁজে বনলতার মতো সুন্দরী রমণী। রতিকান্তর শূন্যতা বনলতা অনুভব করে। বনলতা আবার একাকী জীবনের নিঃসঙ্গতায় পেতে চায় রতিকান্তের মতো পুরুষের সঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই একটা অতৃপ্তি নিয়ে চলে। প্রত্যেকেই যা নেই তার জন্যই ব্যাকুল। এদের জীবনের পাওয়া না পাওয়ার অতৃপ্তি তাদের ক্লান্ত করে।

এবার শুরু হয় ইচ্ছা পূরনের গল্প। এক বুড়ঢ়া জিন সমুদ্র থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নারাতের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় সবার জীবনের উপর। প্লাবিত জ্যোৎস্না ধারায় জীবনের ছন্দ জেগে ওঠে। এক মায়ামায় কাব্যিক আবহ তৈরি করে ‘ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন!’[১৫৮] বলে। ভিন্ন এক আবহে, ভিন্ন এক জীবনালোকে নিয়ে যায়। সত্যসিন্ধু শেঠ— ওরফে সত্য কেবল নামে নয় জীবনের সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্যকারী ক্রিয়ার মতো ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সত্য চরিত্রের মুখে বুড়ঢাজিনের নির্মিত আবহের নিগূঢ় সত্যটি তুলে ধরেন নাটককার—

‘‘রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক
ভুলের মাশুল দিও না আর
শুরু করে দেখো আর একবার
আবার জীবন সাজক তোমার নতুন চোখ
নতুন অতীত এনেছে রাতের কল্পলোক।”[১৫৯]

বাদল সরকারের নাটকে বারবার এই অতীত চেতনা ফিরে আসে। আসলে হালকা মেজাজের নাটক হলেও এখানে বাদল সরকারের নিজস্ব স্বরটি চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বুড়ঢ়া জিন ও ছুট্কু জিনের কেরামতিতে একে একে সবার ইচ্ছা পূরণ হয়। এবারে প্রথম অঙ্কের চরিত্রগুলো যেমন পালটে যায়, তাদের অবস্থানের বিন্যাসও পালটে যায়। পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যায়গুলিও নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে যায়। অর্থহীন জীবনের অনর্থে ভোগা অতসী ব্যবসায়ী ব্রজলালের বউ হয়ে যায়। বনলতা হয়ে যায় রতিকান্তের স্ত্রী। বিবাহের দাসত্বমুক্তি প্রার্থী করুণা এসে যায় বনলতার স্থানে, কিন্তু যে অপ্রাপ্তির অন্বেষণ এতদিন তারা করছিল এবার তা পেয়েও শুরু হয় আবার হতাশা

আবার বিষাদ। মূর্খ ব্রজলালের বউ হয়ে শিক্ষিত অতসী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে অনুভব করে বিলাসিতার ভেতর কোন অনুভূতি নেই। এখন সে অনুভব করে পূর্বের জীবনে বৈভব না থাকলেও সেখানে অনুভূতি ছিল, প্রাণ ছিল। অতসী নিজের ভুল বুঝতে পারে—

''অতসী: (দু'হাতে মাথা চেপে বসে) ওঃ কি ভুল করেছি!

সঞ্জয় : একখানি ভুল
জীবন নির্মূল করে রেখে যায়,
ফেরাবার উপায় রাখে না।''[১৬০]

এদিকে বনলতা রতিকান্তের স্ত্রী হয়ে করুণার মতোই অতৃপ্তিতে ভোগে। রতিকান্তও আবার বনলতার মধ্যে করুণার সেই সাদামাটা, অল্পশিক্ষিত অথচ উদার ও গভীর মমতাময়ী রূপকে না পেয়ে আবার সেই করুণাকেই ফিরে পেতে চায়। প্রত্যাশাপূরণ এবং প্রত্যাশাপূরণে আবার হতাশা ও অতৃপ্তি নাটকের বারবার ফিরে আসে। আসলে সবটাই যে আপেক্ষিক এই সত্যটি নাটককার এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বুড়ঢ়া জিন আবার সকলকে তাদের পূর্বের নিজ নিজ অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। তবে প্রত্যেকে তাদের নিজেদের এই স্মৃতিগুলিকে নিজেদের কাছে সঞ্চিত রাখার অনুমতি পায়— নইলে যে তারা নিজেদের বিশ্লেষণ করতে পারবে না। নাটককার গভীর বিশ্লেষণে না গিয়ে এভাবে সহজ সমাধানে নাটকটি সমাপ্ত করেন। যেন দেখাতে চান যে এভাবে একরাতের ম্যাজিকে তারা বুঝে যায় অন্য আকাঙ্ক্ষায়ও সুখ নেই বা তা যেন ভুল করে চাওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ পর্যন্ত নাটকের মেজাজটি হালকা হয়ে যায়। তবে ভেতরের বুনন সেই জীবন-যন্ত্রণারই বুনন। কোথাও যেন মিলে যায় ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের সেই উপলব্ধি 'পেছনেও যা, সামনেও তাই।'[১৬১]

কবিতায় সংলাপ রচনা এই নাটকের একটি লক্ষণীয় দিক। বাদল সরকার এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেছেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে। এই নাটকে আবার সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এইভাবে কবিতায় সংলাপ রচনা নিয়ে বাদল সরকার মজা করে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

''... সেনগুপ্ত প্রচুর গালাগালি করছে। বলছে-কবিতায় মরতে লিখতে গেলেন কেন? কেউ নেবে না। ... কাবুল তুবুলেরও নাটকে কবিতা ঢোকানোতে খুব আপত্তি। যেমন আপত্তি Serious নাটকে। ....
কিন্তু যাই বলো— কাব্যে লিখতে মজা আছে।''[১৬২]

নাটককারের শুভানুধ্যায়ীদের মনে যতই সংশয় থাকুক না কেন এক্ষেত্রে বাদল সরকার ভীষণ ভাবে সফল। এই নাটকে কবিতার বুনন এবং গদ্যের মিশ্রণে একটা অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। নাটকে মোট দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্গে কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই। নাটকের পর্ব

পরম্পরা ধরলে এই দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজন ছিল না। প্রথম অঙ্কে প্রত্যেকের অপ্রাপ্তি জনিত হতাশা আর দ্বিতীয় অঙ্কে বুড়ঢ়া জিনের কেরামতি এবং শেষে পরিণতি— এটি যথাযথ হওয়া উচিত ছিল। প্রথম অঙ্কের সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের সংযোগ করেছেন 'বিরতি' ব্যবহার করে। কারণ ঐ 'বিরতি'র পর সব অসম্ভবের সম্ভব ঘটিয়েছেন নাটককার। 'হালকা মেজাজে' গঠিত এ নাটক অন্তর্নিহিত ভাবনায় তখন পাঠক কিংবা দর্শকের সামনে বহুধামাত্রায় উদ্ভাসিত হয়।

বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অভিঘাত বারবার ঘুরে ফিরে আসে। এই ধারার একটি নাটক **'ত্রিংশ শতাব্দী'**। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৬ সালে। প্রথম প্রযোজনা করে বহুরূপী, ১৯৬৯ সাল, নিউ এম্পায়ার হল-এ। এই নাটকে কোন অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন নেই। বিরামহীন এই নাটকের বিষয় হিরোশিমা-নাগাসাকির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বীভৎস ইতিহাস। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকটা লেখার একটা ইতিহাস আছে। এটা আমি লিখি ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়ায় বসে। একদিন হঠাৎ একটা বই পড়ি। ফরাসি সাংবাদিকদের লেখার ইংরেজি অনুবাদ। বইটার নাম 'Formula for death, $E=MC^2$। ভদ্রলোক প্রচুর গবেষণা করে জাপান আমেরিকা ঘুরে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন। যাঁরা বোমা ফেলেছেন, আমেরিকার সেই কর্নেল ফেরেবি, ইথার্লি, পল টিবেটস, চেশায়ার প্রমুখ, তাঁদের সবার ইন্টাভিউ নিয়েছিলেন। আবার বোমার যাঁরা ভুক্তভোগী, জাপানের সেই সব মানুষের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। বইটা আমায় ভীষণ নাড়া দেয়। মনে হয়েছিল বইটা বাংলায় অনুবাদ করা উচিত। অনুবাদ আমার আসে না। আমি যেটা জানি, সেটা 'ত্রিংশ শতাব্দী'-তে নাটকের আকারে বেরিয়ে এসেছে।... নাটকটার মূল কথা হল, আমাদেরও ভাববার দরকার আছে, কারণ পরমাণু মারণাস্ত্র মানুষই বানিয়েছে, বন্ধ করলে মানুষই করবে।''[১৬৩]

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য শুধু এই নাটকই নয়, বাদল সরকারের লেখা এর আগে-পরের বেশ কিছু নাটকে বারবার পরমাণু বোমা তথা পরমাণু যুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখি। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এবং 'বাকি ইতিহাস' নাটকে পরমাণু বোমার প্রসঙ্গ এসেছে। ইন্দ্রজিৎকে আমরা বলতে শুনি 'কল্পনা কর, ভুল করে কয়েকটা অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা পড়ে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেলো। ভাবতে পারিস?''[১৬৪] 'বাকি ইতিহাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সীতানাথ শরদিন্দুকে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের ইতিহাসের ছবি দেখিয়ে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিকটি তুলে ধরে বলে—

> ''ঐ পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটার ডান হাতটা নেই, ... হাতটা ছিঁড়ে বোমা খাওয়া জঞ্জালে হারিয়ে গেছে। —ওটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেকগুলো ছবি পাবে— নানা দেশের। —হ্যাঁ, হিরোশিমা। ঠিক ধরেছো। হিরোশিমা।''[১৬৫]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা বাদল সরকারকে কতখানি ভাবিত করেছিল। 'বাকি ইতিহাস'-এর সীতানাথের মত তিনিও যেন ইতিহাসাক্রান্ত। বাকি ইতিহাসের সমাপ্তি নেই, সেই অতীত চর্চা করেই বর্তমান চলে। সেই অতীত চেতনার এই বৈচিত্র্যময় রূপ 'ত্রিংশ শতাব্দী'।

এই নাটকের উপস্থাপক শরৎ চৌধুরী। কে এই শরৎ চৌধুরী? নাটকের শরৎ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের এক ভূতপূর্ব অধ্যাপক যিনি বর্তমানে উন্মাদ। আমাদের মনে হয় 'বাকি ইতিহাস' নাটকের সীতানাথ যে বীজ শরদিন্দুর মধ্যে প্রোথিত করে দিয়েছিল শরৎ চৌধুরী যেন তারই প্রলম্বিতরূপ; যে কিনা 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চা করে এবং অনিবার্যভাবে পাগল হয়ে যায়। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের সমাপ্তিতে শরদিন্দু শেষ পর্যন্ত চাকরি প্রমোশন নিয়েই থাকতে চায়। কারণ তার মনে হয়েছে এটাই একমাত্র বাঁচার পথ। কিন্তু দুঃস্বপ্নের আক্রমণ যে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে তা থেকে শরদিন্দু মুক্ত হতে পারেনি। শরদিন্দুর শরীরে তার আভাস ফুটে উঠেই শেষ 'বাকি ইতিহাস' নাটক—

> ''[শরদিন্দু দু'হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।]
> শরদিন্দু : ... বাকি ইতিহাস! বাকি ইতিহাস!''[১৬৬]

স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় এই যন্ত্রণাই কি শরদিন্দুকে 'ত্রিংশ শতাব্দী'তে শরৎ করে দেয়, করে দেয় উন্মাদ? ১৯৬৫-র লেখা নাটক শরদিন্দু একজন বাংলার মননশীল অধ্যাপক, বিশ্লেষক। ১৯৬৬ সালে লেখা 'ত্রিংশ শতাব্দী'তে সেই শরদিন্দুই কী হয়ে যায় 'শরৎ চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। বর্তমানে উন্মাদ।''[১৬৭] নাটকের শুরুতে শরৎ চৌধুরীকে দিয়ে এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাটককার বলেছেন—

> ''আজ থেকে ... বছর আগে, ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট, মানুষের তৈরি পারমাণবিক বোমায় মানুষের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছিলো। সেই ঘটনার এতো বছর পরে আজ আমরা 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটক উপস্থিত করছি। এ নাটকের

মূল প্রশ্ন— আমেরিকার বোমায় জাপানের শহর হিরোশিমা ধ্বংশ হয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের মতো সাধারণ ভারতবাসীর কোনো দায়িত্ব আছে কি?... এ নাটক সুন্দর নয়। সুন্দরভাবে এ নাটক কী করে করা যায়, আমরা জানি না। ... আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো—নাটকের মূল প্রশ্নটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা।"[১৬৮]

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যলগ্নে মানবতার উপর বর্ষিত হল যে দুটি ভয়ঙ্কর পরমানবিক বোমা তা ছাপিয়ে গেল মানুষের ইতিহাসের যাবতীয় নৃশংসতাকে। এই নৃশংসতার দায় কার? সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্নটিই ভূতপূর্ব অধ্যাপক শরৎ চৌধুরীর আমাদের সামনে রেখেছেন। এই শতাব্দীর সঙ্গে জড়িত সমস্ত ঘটনায় সমস্ত মানুষের দায় থাকা উচিত। এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ জাপানে বোমা ফেলেনি, যুদ্ধও বাধায়নি। কিন্তু তবুও সে দায় আমরা এড়াতে পারি না। কেন এড়াতে পারি না শরৎ চৌধুরী তথা তথ্য প্রমাণসহ যেন বিশ্লেষণে মেতে ওঠে। ডকুমেন্টারি নাটকের মতো উঠে আসে নানা তথ্য। ৬ আগস্ট ১৯৪৫-এর আটটা পনেরো মিনিট যে মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল আমাদের সেই প্রেক্ষাপটেই নিয়ে যেতে চায় শরৎ চৌধুরী। বোমা ফেলার আবহ তৈরি করে এবং তার মধ্যে থেকে ঐ কর্মের নায়ক প্রতিনায়কদের ধরে ধরে বিচার করে সে। আসলে মানুষের সামনে অভ্যন্তরীণ ইতিহাসটা তুলে ধরা প্রয়োজন, সে কারণেই এই বিশ্লেষণ। প্রকৃতপক্ষে পরমাণু বোমা মানবসভ্যতার উপর যে কী সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তার বীভৎস ও ভয়ঙ্কর স্বরূপ বোঝানো যেন লেখকের দায়। তাই অজস্র তথ্য এখানে নাটকের আঁধারে এবং উপযুক্ত আঙ্গিক বলা হয়েছে। কেন এই দায় তিনি নিয়েছেন; আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এই সমস্ত তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? আসলে ভারতবর্ষও আজ পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র। যার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ২৮ মে, ১৯৭৪ সাল, রাজস্থানের মরুভূমিতে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বার ১৯৯৮-এর ১১ ও ১৩ মে রাজস্থানের পোখরানে একইভাবে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ভারত গোটা বিশ্বের সামনে নিজেকে তুলে ধরে, কিন্তু এর কুফল ভোগ করে সেখানকার সাধারণ মানুষ। কিছুদিনের মধ্যে অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথচ তারা তো কোন অন্যায় করেনি। বাদল সরকার উপলব্ধি করেছেন ১৯৪৫-এর বীভৎস ঘটনার পরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও কোনো শিক্ষা নেয়নি। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না দুটি পেট ভরে খেতে চায়, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল চায়। বাদল সরকার লিখেছেন—

"পোখরানের আশেপাশের লোকেরা ১৯৭৪ সাল থেকে বলছে— ৩২ কিলোমিটার হাঁটতে হয় হাসপাতালে পৌঁছবার জন্য, আমাদের যে অসুখগুলো

হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য একটা হাসপাতাল বানিয়ে দাও। '৭৪ থেকে '৯৮ হয়ে গেল, হাসপাতাল বানানো হয়নি।"[১৬৯]

তাই এত কথা, এত অনুসন্ধান, এত তথ্য। এতে হয়তো নাটকের শিল্পমূল্য খানিকটা ব্যাহত হয়েছে, হয়তো 'এ নাটক সুন্দর'[১৭০] হয়ে উঠেনি কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এদেশে যার কোন আঁচ লাগেনি অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে এই বীভৎসতার চিরচিহ্ন যেভাবে মানব-ইতিহাসকে অপমানিত করেছে তার স্বরূপ বোঝানো প্রয়োজন। শরৎ চৌধুরী সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন সেই ঐতিহাসিক মানুষদের। সামগ্রিক স্বরূপ তুলে ধরতে সেই ঘটনার নায়ক-প্রতিনায়কদের— যারা আকাশে ছিল, যারা মাটিতে ছিল এবং সর্বোপরি পশ্চাৎপটে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনেতা ছিল তাদের কিছু প্রতিনিধি তুলে এনে তাদের মুখ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তিন দিক থেকে বিভিন্ন কৌণিক মাত্রায় দেখা হয়েছে নাটকে। যারা সেদিন আকাশ থেকে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন হিরোশিমা ও নাগাসাকির বুকে, তাদের মধ্য থেকে তুলে আনা হয় পাইলট ফেরেবি ও ক্লডকে। একটি ক্রিয়া অন্যটি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই দু'জনকে বাছা হয়েছে। ফেরেবির কাজ ছিল সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। ফলে তার কাছ থেকে জানা যায় কেন জনবহুল বেসামরিক শহর নাগাসাকি-হিরোশিমাকেই পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য বাছা হয়েছিল। শুধু তাই নয় কোন জায়গায় কোন মুহূর্তে বোতাম টিপলে ধ্বংসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে সেই পরিকল্পনাও উঠে আসে তার কথায়। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সেদিন নাগাসাকি-হিরোশিমার দিকে উড়ে যায় এগারোজনের একটি দল। তার বর্ণনায় ফেরেবি স্মৃতি রোমন্থন করে বলে—

> ''আমরা উড়ছিলাম প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে। অন্য দু'টো বি-টোয়েন্টিনাইন প্রায় বারো মাইল পেছনে পাশাপাশি ছিল। সকাল হবার একটু পরে ডাঙা দেখা গেল। প্লেন আরো উঁচুতে তোলা হলো। ন্যাভিগেটরের দেওয়া কোঅর্ডিনেট্সের সঙ্গে মিলিয়ে হিরোশিমার ত্রিভুজাকৃতি অন্তরীপ দেখতে পাওয়া গেল। র‍্যাডারের এর নির্দেশ না থাকলেও আমার চিনতে অসুবিধে হোতো না।
>
> ....
>
> দু'মিনিট সময় ছিল হাতে। ইনোলা গে ঘুরছিলো যখন, তখন বোমাটা ফাটলো, মাটি ছোঁবার কিছু আগে। ইনোলা গে যখন সম্পূর্ণ ঘুরেছে তখন হিরোশিমা অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা ঘন মেঘের আড়ালে।"[১৭১]

অসম্ভব তেজস্ক্রিয় শক্তিসম্পন্ন অ্যাটম বোমায় যে কল্পনাতীত ধ্বংসলীলা চলেছিল তাতে ফেরেবির যাই হোক না কেন, পাইলট ক্লড উন্মাদ হয়ে যায়। এখানে ফেরেবির প্রতিক্রিয়া বাহ্যিকভাবেই

ব্যক্ত হয়েছে, কারণ ফেরেবি পাইলট ক্লডের মতো উন্মাদ হননি। ফেরেবির খুব সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, মাত্র দুটি শব্দে 'রেজাল্ট্স্ গুড'[১৭২]। কিন্তু পাইলট ক্লড অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন। ক্লডের স্ত্রী ইথারলির বয়ানে উঠে আসে সেই অপরাধবোধের কথা—

> ''ঐ সময়ে ক্লডের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যেতো। সমস্ত মুখ যন্ত্রণা আর ভয়ে এমন বিকৃত হয়ে উঠতো— ওকে চিনতে পারতাম না। সারা শরীর কাঁপতো। সকালে দেখতাম— জ্বর এসেছে। কথা বললে শুনতে পেতো না। মাঝে মাঝে দু'চোখ বড়ো করে মেলে আমাকে বলতো— জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও, হিরোশিমা যেতে হবে। পেন্টাগন হুকুম দিয়েছে, হিরোশিমা গিয়ে আমাকে দেখতে হবে— ওখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের কী হয়েছে?''[১৭৩]

মানচিত্র থেকে হিরোশিমা নাগাসাকি মুছে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু ক্লডের মন থেকে তা মুছে যায়নি, মুছে যায়নি শরৎ চৌধুরী তথা লেখকেরও। আসলে সাফল্যের বিপরীত এই প্রতিক্রিয়া নাটকের মূল বক্তব্যকে ধরিয়ে দেয়। ক্লডের ঐ মানসিক যন্ত্রণার কারণ বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে সেই অভিশপ্ত পোড়ো জমিতে। তৎক্ষণাৎ দু'লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। আণবিক বোমা অমানবিক কাজে ব্যবহৃত হলো আর পারমাণবিক রোগের শিকার হলো পৃথিবীর মানুষ। যেখানে এখনো হাজার হাজার বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়। এই ঘটনার জন্য শরৎ কাউকেই রেয়াত করে না। আইনস্টাইনকেও জেরা করা হয়। তার ১৯৩৯-এর ২রা আগস্ট লেখা চিঠি পেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চব্বিশশো কোটি টাকার মানহাটন প্রজেক্ট তৈরি করেন। তাতে সারাবিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী যোগ দেন। তৈরি হয় আণবিক বোমা। হিরোশিমার ছবি দেখেন আইনস্টাইন। স্বীকার করেন হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।

ইতিহাস, ভয়ানক এক ইতিহাস। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের দায় নেবে কে? বিংশ শতাব্দীর মানুষ শরৎ এর দায়ভার বহন করে। শরৎ যেন বিংশ শতাব্দীর বিবেক—

> ''... আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি আসামী। আমাকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো। বিংশ শতাব্দীকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো।
>
> .....
>
> বিংশ শতাব্দী অভিযুক্ত। আমি বিংশ শতাব্দী।''[১৭৪]

নাটকের শেষে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতার এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের কৈফিয়ৎ দিতে চায় শরৎ আগামী ত্রিংশ শতাব্দীর কাছে। যে অতীত নিয়ে 'ত্রিংশ শতাব্দী' আসবে তা যে ভয়ানক।

সেই অতীত তো তাকে চেহারা দেবে, সভ্যতার চেহারা। তাই শরৎ বলে—

> ''শোনো। ত্রিংশ শতাব্দীর অমৃতের পুত্ররা শোনো! তোমাদের অমৃত—আমি! তোমাদের অমৃত মন্থিত হয়েছে আমার শতাব্দীর বিষে! তোমাদের জন্ম আমার আমার শতাব্দীর যন্ত্রণাবিকৃত গর্ভবেদনায়। কাকে বিচার করছো? নিজের মাকে? গর্ভধারিণীকে? বলো! জবাব দাও!
>
> ....
>
> ... আমি, শরৎ চৌধুরী, শতাব্দীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বলছি— আমি জবাব দেবো!''[১৭৫]

'ত্রিংশ শতাব্দী'কে আমরা ডকুমেন্টারি নাটক বলতে পারি, এর প্রকৃতি ডকুমেন্টারি নাটকের মতন। একেবারে প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এই নাটক রচিত। আগাগোড়া অসম্ভব সিরিয়াস এ নাটকের আঙ্গিকটিও লক্ষণীয়। বিষয় যেমন অত্যন্ত সিরিয়াস, তেমনি তার গঠনশৈলী। কোথাও দর্শকের জন্য বিরাম নেই, রিলিফ নেই। কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। নির্মাণশৈলীতে অদ্ভুত একটা প্রবাহ আছে। নাটকের বিষয় সময়ের সঙ্গে এতো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে ইতিহাস সচেতন নাটককার যে দিন নাটকটি অভিনয় হবে তার তারিখ এবং সমসময়ের মারণাস্ত্রের ঘটনাকে অঙ্গীভূত করার কৌশল রেখে দেন। নাটকের মুখ্য চরিত্র শরৎ একটা নাটক উপস্থাপন করছে এবং তাতে অতীতের ঐ সমস্ত মানুষকে এনে জেরা করা হবে। সেই উপস্থাপন ভঙ্গিটির মধ্যে প্রথমেই সুযোগ থাকে নাটকের অভিনয়ের তারিখ বলার এবং সেই সময় থেকে কত বছর পূর্বের ঘটনা বলছে তাও বলে দেওয়ার। নাটক শুরুর মূহূর্তে শরৎ চৌধুরী ঘোষণা করে—

> ''শরৎ : আজ ...,* আজ থেকে ... বছর আগে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিলো।''[১৭৬]

ফুটনোটে '*' চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে 'অভিনয়ের দিনের তারিখ'।[১৭৭] আর তখন থেকে বছর হিসেব করে ওই শূন্য স্থান পূরণ করা হবে। বলাবাহুল্য ইতিহাসকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে সংযোগের এই আশ্চর্য কৌশলটি অসাধারণ আঙ্গিক সচেতনতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয় ওই ইতিহাস কেন আজও প্রাসঙ্গিক শরৎ চৌধুরীর বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে—

> ''১৯৬৬ সালে লেখা হয়েছিল এই নাটক। তখন থেকে প্রশ্নটা অনেক তীব্র হয়ে উঠেছে ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে, যেদিন রাজস্থানের মরুগর্ভে ভারতবর্ষের অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। ঐ বছরই ৬ই আগস্ট এই নাটকের প্রথম অভিনয় করেছিলাম। মনে হয় আজও এই নাটকের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

কমেনি বরং বেড়েছে।”[১৭৮]

আজকের দিনে যখন এই নাটক অভিনীত হবে সেখানে ১৯৯৮-এর পোখরানের প্রসঙ্গ আসবে। এভাবেই এদেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে অনিবার্যভাবে গ্রথিত হয়ে যায় ১৯৪৫-এর সেই বীভৎস ইতিহাস। নাটকের শুরু এভাবেই হয় বলে এর ভেতরেই সময়ের প্রবাহকে এমনভাবে ধরা হয় যে তা যেন ত্রিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। নাটককার বাদল সরকার তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানায় স্থান-কাল-পাত্রসহ সমস্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক রৈখিক করে দিয়ে যখন যে মুহূর্তে আমরা আছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। নাটকের অন্যতম চরিত্র পদার্থবিদ, শরতের বন্ধু সাধন শরৎকে বলে, ‘‘তোর কাগজপত্র তো সব এলোমেলো দেখছি। কোথা থেকে শুরু করবি?”[১৭৯] উত্তরে শরৎ বলে—

> ‘‘কী আসে যায়? এক জায়গা থেকে শুরু করলেই হোলো।
>
> .....
>
> ছয়ই আগস্ট ১৯৪৫ সকাল আটটা বেজে পনের মিনিট-একটা মুহূর্ত! সেই মুহূর্তে অনেক কিছু আরম্ভ, অনেক কিছু শেষ। যা আরম্ভ তা এখনো শেষ হয় নি। যা শেষ তা আরম্ভ হয়েছে মানব সভ্যতার জন্মদিনে। কী আসে যায়— কোথা থেকে শুরু করলাম তাতে?”[১৮০]

‘ত্রিংশ শতাব্দী’ নাটকে নাটককার বাদল সরকার ইতিহাসের সেই ঘটনাকে তুলে আনতে চেয়েছেন বর্তমানে, কিন্তু ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে নয়। একেবারে প্ল্যানচেটের মতো একটা অদ্ভুত বিষয়কে গ্রহণ করা হয়, অতীতকে জাজ্বল্যমান করার জন্যে। এই কৌশলেই সেই ভয়াবহ ঘটনার সমস্ত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নাটকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আসলে নাটককার যে বিষয়কে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তাতে এটাই একমাত্র আদর্শ আঙ্গিক। অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানে তুলে আনার ক্ষেত্রে এই আঙ্গিক নির্মাণ অত্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। নাটকের বিন্যাসক্রমটিও সেই অনুযায়ী যথোপযুক্ত। আকাশে যারা ছিলেন, মাটিতে যারা ছিলেন আর যারা এর প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন প্রত্যেকের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ঘটনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ একটি অত্যন্ত উদ্দেশ্য সফলন উপস্থাপনা।

বাদল সরকারের নাইজেরিয়া প্রবাস জীবনের শেষ নাটক **‘পাগলা ঘোড়া’** নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৭ সালের ২০শে জানুয়ারি থেকে ২৫ শে জানুয়ারি। এই সময় বাদল সরকারের মনে জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। যার বর্ণনা পাওয়া যায় সেই সময়ের লেখা ডায়েরি ও

চিঠিপত্রে। ১৫.১.১৯৬৭ লেখা ডায়েরিতে লিখছেন—

> ''ধরা যাক-একটা মেয়ে। তার জীবনের একটা মুহূর্ত। কিম্বা তার মৃত্যুর পরের মুহূর্ত। তার ছোটবেলা, তার বড়ো হওয়া, তার নানারকম সম্পর্ক, তার জীবনের নানান দিক-একটা ক্যালিডোস্কোপের টুকরো ছবিতে ফুটে উঠছে, আবার বিশ্লেষিতও হচ্ছে। আর মানুষ বেরিয়ে আসছে আর জীবন বেরিয়ে আসছে, কারণ মৃত্যুর মতো জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে আর কিছুই পারে না।
> (শ্মশানবন্ধু ? চারজন ?)''[১৮১]

বুঝতেই পারছি এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক নারী চরিত্র যাকে নাটককার 'মেয়েটা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার নির্দিষ্ট নাম নেই। কেন তার নাম নেই সে সম্পর্কে স্বয়ং নাটককারের বক্তব্য এইরকম—

> ''কী লিখছি আমি জানি না। কিন্তু একটা ঘোরের মধ্যে থাকি খানিকক্ষণ লেখার পর থেকেই। মালতী, মিলি, লছ্‌মি কেমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। সামনে দেখতে পাই যেন। এদের কাউকেই দেখেছি কি ? আলাদা আলাদা করে দেখি নি। কিন্তু যাদের দেখেছি তাদের সকলের মধ্যেই এরা একটু একটু করে ছিল। মালতী, মিলি, লছ্‌মি— আর ঐ মেয়েটা যার কোনো নাম নেই, যে একাই মালতী মিলি লছ্‌মি সে নিজে— সব।''[১৮২]

অর্থাৎ সঙ্গত কারণেই 'মেয়েটা' বলা হচ্ছে। আসলে এই 'টা' যোগ করে সমাজে নারীর যে অবমূল্যায়নই প্রকাশিত করা হয়েছে। বস্তুত বাদল সরকারের অন্য কোন নাটকে এই অর্থবহ ধ্বনি সাযুজ্যময় চরিত্র নেই। যদিও প্রতীকী চরিত্র তিনি এনেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ছাড়াই। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের যে সম্বোধন 'মেয়েটা' কথাটির মধ্যে থাকে তাই যেন তীব্রভাবে কোথাও আয়রনি সৃষ্টি করে।

নাটকের ঘটনা ঘটে চলেছে শ্মশানে। সেখানে পুড়ছে একটা মেয়ে। এই মেয়েটাকে যারা শ্মশানে দাহ করতে এনেছে, তারা চিতা জ্বালিয়ে, মেয়েটিকে চিতায় ছড়িয়ে বসে আছে নীরন্ধ্র অন্ধকারের নীরবতায়। হিমাদ্রি, শশী, সাতু আর কার্তিক-এই চার শ্মশানবন্ধু। এরাও ওই মেয়েটির মতোই সাধারণ। একেবারেই সাদামাটা নিস্তরঙ্গ জীবন তাদের। অথচ এদের প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে একটা জীবন-যে জীবন অবচেতন থেকে উঠে আসে সুযোগমতো। শ্মশানের পটভূমিতে, মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে সেই জীবনকে ধরতে চেয়েছেন নাটককার।

পশ্চিমী পুরাণকল্পে মৃত্যুর দূত হয়ে যে ঘোড়া আসে— এ নাটকে তার ক্ষীণ আভাস থাকলেও

সেই প্রতীকী চিত্র কলা এখানে নাটককার ব্যবহার করেননি। এখানে 'পাগলা ঘোড়া'-র রূপকল্পে মানুষের ভালোবাসার সুতীব্র গতিময়তাকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকের ভিতরে রয়েছে সেই পাগলা ঘোড়া। যা কিনা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে চিতা জ্বলছে, হারানোর, বেদনার, হাহাকারের—তাতেই তো পুড়ে চলছে প্রত্যেকের জীবন, তার চাওয়া-পাওয়া, তার প্রেম-ভালোবাসা। মেয়েটা হতে পারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সাধারণ, কিন্তু সেও জীবনকে ভালবেসেছিল তার মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল জীবনের প্রেমে পাগল হতে চেয়েছিল। কিন্তু পাগল প্রেমের অর্থহীনতায় ভুগে সে আজ চিতায় ওঠে। আর সেই আগুনে এক এক করে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকের 'পাগলা ঘোড়া' তাদের জীবনকে শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, জীবনকে শ্মশান করে—

> ''সাতু : ... মনে হচ্ছে যেন একটা গল্প আছে এর মধ্যে?
>
> .....
>
> মেয়েটা: গল্প? কার গল্প নেই? কার রহস্য নেই? তোমরা? তোমাদের গল্প নেই? তোমাদের রহস্য নেই? বার করে নিয়ে এসো না গল্পগুলো! আমাদের সব গল্পগুলো। দেখবে সব গল্প মিলেমিশে একাক্কার হয়ে গেছে। তোমাদের গল্প, আমাদের গল্প—সব—মিলেমিশে একাক্কার—''[১৮৩]

মেয়েটা ছায়া ফেলে প্রত্যেকের মনে। তাকে উপেক্ষা করতে পারে না কেউ। অন্ধকারে এবং শ্মশানের চিতার আগুনে উঠে আসে প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন। মেয়েটার জীবনের সঙ্গে কোথাও না কোথাও তাদের সেই জীবন মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

হিমাদ্রি ছিল স্কুল টিচার। তার এই গতানুগতিক জীবনে একটি মেয়ে এসেছিল। কিন্তু একটা সিস্টেমের শিকার হয়ে হিমাদ্রি তার সঙ্গে প্রেমে পাগল হতে পারেনি। মেয়েটা চেয়েছিল জীবনের প্রেমে পাগল হতে, যার অভাববোধ তাকে বিপন্নতার দিকে নিয়ে গেছে। আর হিমাদ্রি তা পেয়েও নিতে পারেনি। হিমাদ্রির মতো সামান্য এক স্কুল টিচারের পক্ষে উচ্চবিত্তের মেয়ে মিলিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের শিকার হয়ে জীবনকে ঘোড়ার গতি দিতে পারেনি। অন্যদিকে মিলি হিমাদ্রির জগতে ঢুকতে চেয়ে পারেনি, চেষ্টা করতে করতে নিজের জগৎ খুইয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে—

> ''মিলি : ''না। আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে ষোলো আনা ঢুকতে পারিনি, কিন্তু আমারটা খুইয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।''[১৮৪]

সাতু একজন ঠিকাদার। সেই সুবাদে তার জীবনে কোনদিন কুলিকামিন মেয়ের অভাব হয়নি। এইভাবে জীবন উপভোগকেই সে জীবনের সবকিছু পাওয়া বলে ভেবেছিল। কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্থলে যে পাগলা ঘোড়া রয়েছে সে তাকে জানান দেয় ''ওসব কিছু নয়... আপনিও জানেন, আমিও জানি-আসল ব্যাপারটা আলাদা।''[১৮৫] যে লছ্মি একদিন সাতুকে ভালোবেসে কাছে পেতে চেয়েছিল আজ এতদিন পর সেই লছমির জন্য তার মন কেমন করে। শ্মশানে একটি কুকুরের ডাক সাতুর মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনে অতীত স্মৃতিকে— লছমিকে। লছমির ছিল চিরসঙ্গী একটা কুকুর। সেই ডাক শুনে সাতু ফিরে যায় অতীত স্মৃতিতে। লছমি একটা ভালোবাসার নীড় গড়তে চেয়েছিল। থাকতে চেয়েছিল সাতুর কাছের। সে তার বাবু সাতুকে পাগলের মতো ঘিরে থাকতে চেয়েছিল—

> ''লছ্মি : আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি, আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। কেউ জানতে পারবে না— ... তবু—তবু—তোমার কাছে থাকতে দাও— তোমার কাজ করতে দাও— আমি কাউকে জানতে দেবো না—''[১৮৬]

কিন্তু সেদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই প্রত্যাখ্যান দিনদিন বেড়ে চলে এবং একসময় সে বেঁচে থেকেও জীবন থেকে সরে যায়। এই প্রত্যাখান যেন জীবনকে প্রত্যাখান। আজ সাতু গভীর অপরাধবোধে ভোগে। তার জন্যই হারিয়ে গেছে লছমি। সাতুর সমস্ত অবিচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কুকুর তার মালকিনের হয়ে। কুকুরের ডাক তাই সাতুর কাছে বিশেষ মাত্রা নিয়ে আসে, অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে তাকে অপরাধ বোধে ডুবিয়ে দেয়। লছ্মির ভালোবাসা তাকে যতখানি জীবন দেখাতে পেরেছিল, মেয়েটার মৃত্যু আজ বেশি করে সেই ভালোবাসার গভীরতা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই সাতু মেয়েটার জ্বলন্ত চিন্তা দেখে আজ উপলব্ধি করে, '... মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব।'[১৮৭] সাতু শেষ পর্যন্ত একটা জীবনদর্শনে পৌঁছায়—

> ''দর্শন করে শুধু এই মনে হয়েছে যে জীবনটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না।
>
> ...
>
> জীবনটা শুধু মৃত্যুই আনতে পারে।''[১৮৮]

কার্তিক একজন কম্পাউন্ডার। সে জীবনকে দেখেছে অন্যভাবে। তার উপলব্ধি: 'বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।'[১৮৯] কার্তিক তার জীবনের পাগলা ঘোড়ার গল্প ঘুরিয়ে বলে। সে এক রাস্তার মুচির গল্পের মোড়কে নিজের কথা বলে যায়। নাটকের কোন চরিত্রই সরাসরি নিজের গল্প বলে না। মুচির গল্পের মধ্য দিয়ে কার্তিক নিজের গল্প বলে চলে। তার সে প্রেম অনাস্বাদিত

এক স্বর্গীয় সুষমায় ঋদ্ধ। দুঃসাহসী নয়। কেবল দেখে যাওয়া। মনে তার নিত্য আসা যাওয়া। একদিন সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পরে মেয়েটি আবার ফিরে আসে। মুচি খবর নিয়ে জেনেছে বিবাহিত জীবনে মেয়েটি কোন সুখ পায়নি। মুচি সবটাই দেখে চলে। কথা বলতে পারে না। সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে। আবার মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে নিজেকে জুড়ায়-ও। কার্তিক বলে: 'আগে যদি জানতাম রে সই, প্রেমের এতো জ্বালা—"[১৯০] যে মেয়েটির কথা কার্তিক বলে তার সঙ্গে ঐ 'মেয়েটা'র জীবনের কী অদ্ভুত মিল! 'মেয়েটা'র জীবনেও উন্মাদ স্বামীর পাল্লায় পড়া আছে, বিবাহিত জীবনের অনাস্বাদ আছে, শেষাবধি পালিয়ে এসে মল্লিকবাবুর 'মেয়ে চটকানো' লোকের পাল্লায় পড়া আছে। তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের অর্থহীনতায় ভুগে পাগলা ঘোড়ার মতো পাগল প্রেমের অভাবে মেয়েটা মৃত্যু কামনা করে কার্তিকের কাছে বিষ নিতে আসে। কার্তিক মেয়েটাকে সাত দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। কোথাও যেন কার্তিকের মনেও পাগলা ঘোড়ার উন্মাদনা কাজ করেছিল, 'বেঁচে থাকলে— সবই সম্ভব'[১৯১] এরকম একটা ক্ষীণ আশা কার্তিকের ভিতর কাজ করেছিল। পাগলা ঘোড়ার মতো পাগল প্রেমের অভাবে মেয়েটা কার্তিককে সাতদিনও সময় দিল না। কিন্তু যদি মেয়েটা জানতে পারত যে দিনের পর দিন তারই প্রেমে একজন নিঃশব্দে, গোপনে প্রতীক্ষা করে আছে তাহলে কী সে মরতে পারত এভাবে! না, তাহলে মেয়েটা এভাবে মরতো না। মেয়েটা জীবন যন্ত্রণা চেয়েছিল, মরণ যন্ত্রণা নয়। কেবল জ্বলতে চায়নি জুড়াতেও চেয়েছিল—

> ''পাগলা ঘোড়া— কেন সেরকম করলে না? কেন আমাকে দিয়ে কারো মন ভরালে না? কেন কাউকে দিয়ে আমার মন ভরালে না? কেন তোমার চোখে ঠুলি? কেন? কেন?"[১৯২]

চিতার আগুনে চড়ে, 'মেয়েটা' যখন জানতে পারল, তখন চিতা থেকে আর্ত চিৎকার করে বলে—

> ''...নামিয়ে নিয়ে এসো! এখনো পুড়ে শেষ হয়নি—
> এখনো জ্বলছে— নামিয়ে নিয়ে এসো— পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে
> নিয়ে এসো— আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো— পাগলা ঘোড়া—!"[১৯৩]

এটাই বাস্তব। মানুষ এভাবেই মরতে মরতেও বাঁচতে চায়। জ্বলতে জ্বলতে জুড়াতে চায়। মেয়েটা চরিত্রের ভেতর দিয়ে এক আশ্চর্য দর্শন তুলে ধরেন নাটককার কার্তিককে নাটকের শেষ পর্যন্ত সামিল করে। কার্তিক বিষ মিশ্রিত পানীয় ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে ভাবে: '... বেঁচে থাকলে— সবই সম্ভব?[১৯৪] এভাবেই দর্শন পাল্টায়। এতদিন যে দর্শনে আস্থা ছিল এখন তা প্রশ্নের মুখোমুখি।

এই নাটকের কাহিনির বুনন সত্যিই অভাবনীয়। প্রত্যেকের গল্প এক রকম আবার সবার

গল্প মিলেমিশে একাকার। নাটকের মুখ্য চরিত্র 'মেয়েটা'-ই যেন টেনে আনে সে গল্প। যেমন আবার শশীর জীবনের গল্প। শশী ভালোবেসেছিল মালতীকে। মালতী শশীর সমবয়সী খুড়তুতো ভাই প্রদীপের বাগদত্তা ছিল। প্রদীপ ছিল দুশ্চরিত্র। তাই প্রদীপকে মালতী ঘৃণা করে তাকে বিয়ে না করে শশীর কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু শশী পারেনি-সমাজ ও মন এই দুইয়ের বাধায় শশী সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সে মালতীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। শশীর এই উপেক্ষার কারণেই মালতীর মৃত্যু হয়। অথচ শশী মনে মনে মন থেকে তাকে ভালোবেসেছিল। প্রেমের ঘোড়া তাকেও আজ পাগলের মতো ভেতরে ভেতরে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পাগলা ঘোড়ার শিকার হয়ে আজ সে পুড়ে মরবে অন্তরে অন্তরে। এই অন্তরবহ্নির রূপটা শ্মশানে মদের নেশায় খানিকটা বেরিয়ে আসে। 'মেয়েটা' মালতী হয়ে ছায়া ফেলে। শশী বারবার অতীত স্মৃতিতে ফিরে যায়। মালতীর করুণ আর্তি তাকে নাড়ায়। তবুও প্রেম তাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে শেখায় না। যন্ত্রণায় সর্ব নিঃস্ব হতে শেখায়। মালতীর উপর অবিচারের জন্য শশী সারাজীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। শশী নিজের প্রেমকে হত্যা করে মালতীকে হত্যা করেছে। দুশ্চরিত্র প্রদীপ মালতীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। যে রূপার ছুরিটি কিনা শশীরই দেওয়া উপহার। শশী নিজের কাছ থেকে পালাতে পারে না। এই না পারার যন্ত্রণায় শশী ক্লিষ্ট হতে থাকে। নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় শশী। শশীর জীবনের গল্প আসলে শশীর একার হয়েও হয়ে যায় অনেকের, অসহায় মধ্যবিত্ত বাঙালির, যাদের হৃদয় এভাবেই পুড়তে থাকে। এইভাবে প্রত্যেকের গল্প পৃথক হয়েও শেষ জিজ্ঞাসায় এসে একইভাবে কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেকের হৃদয় চিতা জ্বলতে থাকে। অর্থহীনতায় ভোগে সবাই। যেন সমস্ত বিষয়ই এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা নিয়ে আসে। তবে এতকিছুর পরেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাননি নাটককার। তাই নাটকে দেখা যায় 'মেয়েটা' থেকে শুরু করে প্রত্যেকের মধ্যেই জীবনতৃষ্ণার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের মূল্যায়ন করতে নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামানন্দ জালান লিখেছেন—

> ''যতদূর মনে পড়ছে, নাটক শেষ করে বাদলদা নিজেই বলেছিলেন, এটা একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প।
>
> .....
>
> —একটি নয়, চারটি। ... উনি নিজে ... এই বিশ্বাস করেন যে আমরা একটা জীবন পেয়েছি। আমাদের পিছনেও কুয়াশা, সামনেও তাই। কোথাও রাস্তাটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের শুধু হাঁটতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। জীবনে দুঃখও আছে সুখও আছে। নিরাশার গহন অন্ধকারের মধ্যেও আশা আছে।

মৃত্যুকে খোঁজা নিরর্থক।"[১৯৫]

শ্যামানন্দ জালানের উক্ত মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত। নির্লিপ্ততার মধ্যেও যে জীবন লুক্কায়িত তা ফুটে ওঠে শ্মশানের বহ্নিচিতায়। তা যেমন রাত্রির মতো অন্ধকার, তেমনি আগুনের মতো সত্য। বাদল সরকার এই নাটকে সেই সত্যেরই উদ্ঘাটন করেছেন। আমরা যেন কার্তিকের মত বিষভরা পানীয় গ্লাস মুখের সামনে ধরেও বলতে পারি 'বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব!"[১৯৬]

বাদল সরকার নিজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তাঁর লিখিত নাটকে খুব কম কথাই বলেছেন। কিন্তু এতদিনের অনুচ্চারিত সেই রাজনৈতিক জীবনই এবার উঠে এলো এই পর্বে লেখা তাঁর '**সার্কাস**' এবং '**শেষ নেই**' নাটকে। নাট্যাভিনেতা কুমার রায় 'শেষ নেই' নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> ''...বাদলবাবুর যে চিন্তা, মোটামুটি খানিকটাপ এই যুদ্ধ, যুদ্ধ পরবর্তীকালের মানুষ এবং যুদ্ধের পরের সমস্যা—বিশ্ব সমস্যা যার জন্যেই উনি 'ত্রিংশ শতাব্দী' লিখতে পারেন। যার জন্যে 'বাকি ইতিহাস' লিখতে পারেন। যার জন্যে 'শেষ নেই'ও লিখতে পারেন। এ সবগুলোই তো প্রায় একটা ট্রিলজি-র মত— এই তিনটে।"[১৯৭]

১৯৬৫-তে লেখা 'বাকি ইতিহাস'-এর সঙ্গে এবং ১৯৬৬-তে লেখা 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকের বিষয়ের সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে দেখেছি। কিন্তু এ দুটি নাটকের অনেক পরে লেখা 'শেষ নেই' (১৯৭০) নাটককে কুমার রায় কেন তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আমাদের ভাবতে হবে বৈকি।

আসলে বাদল সরকারের নাটকে যুদ্ধ, যুদ্ধপরবর্তী সময়ের মানুষ এবং যুদ্ধের পরের সমস্যা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। পরাস্ত মানুষের বেদনা বাদল সরকার ভুলতে পারেন না। এই বিষয়গুলির প্রতি ইঙ্গিত করে কুমার রায় বুঝিয়ে দেন, এই ধারাটিকে এভাবেই শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত। সেই ধারায় অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে যায় 'শেষ নেই' নাটকটি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই নাটক লেখার প্রায় এক বছর আগে বাদল সরকার 'সার্কাস' নামক একটি নাটক লেখেন। কিন্তু নানা কারণে নাটকটি অভিনয়ের মুখ দেখেনি। নাটকটি প্রকাশ করারও খুব একটা আগ্রহ ছিল না। এই নাটকের বিষয়কেই আত্মস্থ করে পরে তিনি এই 'শেষ নেই' নাটকটি রচনা করেন। বাদল সরকার তাই লিখেছেন—

> ''সার্কাস' নানা কারণে অভিনয় করা হয়নি, প্রকাশ করতেও আমি চাইনি। পরে

'শেষ নেই' লেখা হয়েছে, সার্কাসের বিষয়বস্তুর অনেকটাই সেই নাটকে বলা হয়েছে।"[১৯৮]

আমরা দুটি নাটককেই পাশাপাশি রেখে আলোচনা করব। দুটি নাটকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় ও স্বাধীনতা উত্তর ষাট-সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় অভিঘাত উঠে এসেছে। 'সার্কাস' নাটকে দেখা যায় বিপ্লবী পার্টি তরুণ বিপ্লবী অজয় স্বাধীনতার অর্থহীনতায় ভীষণ হতাশ। অজয় দেখেছে তার গান্ধীবাদী বাবাকে, যিনি চরকা কেটেছেন, জীবনের অনেকটা অংশ ব্রিটিশের জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু অজয় বাবার পথে হাঁটেনি। অজয় বিপ্লবের পথে সমাজবদলের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিপ্লবী পার্টির শ্রেণি চরিত্র স্পষ্টতই হতাশ করে অজয়কে। 'শেষ নেই' নাটকের সুমন্তর ভেতরেও এই হতাশা কাজ করে। সেও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা বিপ্লবী পার্টির সদস্য। কিন্তু পার্টির ক্রিয়াকলাপে সেও হতাশ হয়ে পড়ে। মূলত ১৯৪৯-এর মার্চ দেশব্যাপী যে বৃহত্তম রেল ধর্মঘট হয়েছিল তাকে 'সার্কাস'-এর বিশু এবং 'শেষ নেই'-এর সুমন্ত সমর্থন করতে পারেনি। 'সার্কাস' নাটকে বিনোদের সঙ্গে বিশুর কথোপকথন এবং 'শেষ নেই' নাটকে প্রশান্তের সঙ্গে সুমন্তর কথোপকথন প্রায় একই রকম। উভয় ক্ষেত্রে বিনোদ ও প্রশান্ত পার্টি লাইন মেনে চলেছে। কিন্তু বিশু বা সুমন্ত বিনোদদের মতো বিনা প্রশ্নে পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। আর সেখানেই পার্টির সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়। ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট নিয়ে 'শেষ নেই' নাটকের সুমন্ত প্রশ্ন তুলে প্রশান্তকে বলে—

"তুই নাইন্থ মার্চ দেখেছিস্! রেল স্ট্রাইক নিয়ে কি আমাদের বলা হয়েছিল, আর কি দাঁড়ালো—দেখেছিস! তারপর দিনের পর দিন এই সব মিটিং—মিছিল! কারা করছে? তোর আমার মতো কয়েকটা মধ্যবিত্ত ছেলে। তারা খুব ভালো ছেলে হতে পারে— জেলকে ভয় করে না, ঠ্যাঙ্গানিকে পরোয়া করে না— কিন্তু মজুর কোথায়? কৃষক কোথায়? বিপ্লব কি এই ছেলেগুলো করবে?"[১৯৯]

সুমন্ত একটা সময়ে পার্টি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার কারণ হিসেবে বলেছে—

"যে পার্টি প্রশান্ত দাসের মতো ছেলেকে এই জিনিস বানায়, সে পার্টিতে আর যারই হোক আমার চলবে না।"[২০০]

'সার্কাস' এবং 'শেষ নেই' নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করলে আমরা বুঝতে পারি যে বিশু এবং সুমন্তর মধ্যে বাদল সরকার নিজেই উপস্থিত। কেবল এদের চিন্তায় নয়, ঘটনাক্রমে এবং শেষ পরিণতির হিসেবেও বাদল সরকার নিজস্ব আদলে নির্মাণ করেছেন এই দুটি চরিত্র। 'পুরোনো কাসুন্দি' ঘেঁটে আমরা জেনেছি ছাত্রজীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছিলেন বাদল সরকার যে অন্য কিছু ভাবেন নি। কিন্তু নানা কারণে পার্টির সঙ্গে বাদল

সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়। একটা সময়ে তিনি পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, ডুবে যান নিজের পড়াশোনার জগতে আর অবসর সময়ে একটু একটু করে চলে থিয়েটার চর্চা। যে কারণে 'সার্কাস'-এর বিশু বা 'শেষ নেই'-এর সুমন্তর জীবনে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, সে সমস্ত কারণগুলো বাদল সরকারের ক্ষেত্রে ঘটেছে। বাদল সরকারের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া কিংবা ডিবা নাড়িয়ে চাঁদা তোলা এসব আমরা তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো থেকে পাই। বাদল সরকার রেল অবরোধেও অংশগ্রহণ করেন। তাতে পার্টি'র সতীর্থ অনেকেই ধরা পড়লেও বাদল সরকার ধরা পড়েন নি। 'শেষ নেই' নাটকের সুমন্তর ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যে ভেঙে যাচ্ছে, বাদল সরকার সেটা বিশু ও সুমন্তকে দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে ঠিক ভাবে সিস্টেম কাজ করলে, গ্রামকে ঠিকমতো করে গ্রহণ করলে, শিল্প যা আছে তাতেই বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 'সার্কাস' নাটকে রত্না ও কুমার চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে বাদল সরকার জানিয়েছেন কীভাবে চাষিদের উন্নতি করা যায়, গ্রামের উন্নতি করা যায়। কুমারের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বাদল সরকারের সেই স্বর আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না—

> ''চাষির স্বার্থ হবে উৎপাদন বাড়ানো। সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে নলকূপ বসাবে, সার কিনবে, উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ করবে, তাতে তার হাতে পয়সা আসবে। এক চাষের জায়গায় তিন চাষ হবে, খেতমজুর সারাবছর কাজ পাবে, তার হাতেও পয়সা আসতে শুরু করবে। তার মানে মাল কেনার ক্ষমতা। এই তো বাজার। বাজার পেলে কলকারখানাগুলোর দু'শিফট তিন শিফট চালু করতে বাধা কীসের?''[২০১]

এভাবেই রাজনীতি সচেতন, সমাজ সচেতন বাদল সরকারের বক্তব্য উঠে আসে। বিষয় এবং বক্তব্য যেভাবে 'সার্কাস' এবং 'শেষ নেই' নাটকে উপস্থাপিত হলো এরপর বাদল সরকারের নাটক যে অন্য খাতে বইতে শুরু করবে তার একটা ইঙ্গিত এখানে থেকে পাওয়া যায়। এই কারণেই নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

> ''এইখানে এসেই নাট্যকার বাদল সরকারের অনুসন্ধান চলে নতুন সংযোগ মাধ্যমের। নতুন বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপন করতে চান নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন মাধ্যমে বিন্যাসের সংযোগে।''[২০২]

'এইখানে এসেই' বাদল সরকারের নাটকের বিষয়বস্তু একটা নতুন সংযোগ ঘটে বৈকি। একটা অবসাদ, বিপন্নতাকে অতিক্রম করে নাটকে এলো একেবারে সাধারণ মানুষের কথা, কৃষকদের কথা শ্রমিকদের কথা। 'বাকি ইতিহাস'-এর শরদিন্দুর স্বার্থমগ্ন সুখস্বপ্ন; 'ত্রিংশ শতাব্দী'-এর শরতের

মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বেচ্ছা নির্বাসনকে অতিক্রম করে নাটকে উঠে এলো উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের কথা। নাটক ধীরে ধীরে অনেক বেশি হয়ে উঠছে রাজনীতি সচেতন। আর এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় তার দ্বিতীয় তথা থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটকে। সেই পর্ব নিয়ে আলোচনার আগে আমরা তার প্রসেনিয়াম পর্বের শেষ দুটি নাটক সম্পর্কে আলোচনা করব— একটি 'আবু হোসেন' আরেকটি 'সাগিনা মাহাতো'।

'আবু হোসেন' নাটকটির রচনাকাল ১৯৭১। এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য 'আবু হেসেন' নাটকের সচেষ্ট 'বিকৃতি'। নাম অপরিবর্তিত। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে নাটকের মুখবন্ধে লিখেছেন—

> ''গিরিশচন্দ্রের আবু হোসেন আমার অতি প্রিয় নাটক। ছোটবেলায় এর অভিনয় বেতারে বেশ কয়েকবার শুনেছি। গানের কথা সেকেলে হলেও সংলাপ আর হাস্যরস এখনো আধুনিক। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী 'শতাব্দী' অভিনয় করবে বলে ১৯৭১ সালে এই নাটকটি তৈরি করি। ... আমাদের প্রযোজনার ঘোষণার যেমন 'রচনা গিরিশচন্দ্র ঘোষ/বিকৃতি: বাদল সরকার' বলা হত, প্রকাশিত নাটকেও তাই রইলো, কারণ সেটাই ঘটনা।''[২০৩]

বাদল সরকার 'আবু হোসেন'কে বলেছেন মূল নাটকের বিকৃতি আর নিজেকে বলেছেন বিকৃতিকার। নাটকের গল্প আমাদের জানা। একটি আরব্য কাহিনি 'এক দিনের বাদশাহ'কে নিয়ে। আবু হোসেন একজন গরিব মানুষ, খুবই অতিথিপরায়ণ। ফলে সব সময় অভাব আর পাওনাদারদের তাগাদা। তখনকার চলন অনুযায়ী বাদশাহ হারুণঅল রশীদ রাত্রে তাঁর প্রজাদের ভালো-মন্দ নিজের চোখে দেখবার জন্য, ছদ্মবেশে শহরে বেরোতেন। আর এভাবেই একদিন আবু হোসেনের সঙ্গে বাদশাহের দেখা হল। যথারীতি আবু তার স্বভাব অনুযায়ী বাদশাহের সেবা করলেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে আবুকে কিছু দিতে চাইলেন। আবু তখন তার মনের সুপ্ত বাসনা প্রকাশ করে বাদশাহকে বলে—

> ''... আমার বড় উঁচু খাঁই।
> একদিন যদি বাদশাইটা পাই, তো হুকুম চালাই।''[২০৪]

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই আবু নিজেকে বাদশাহের মহলে পেল। চারিদিকে চাকর-বাকরের ভিড়, খাওয়া-দাওয়ার বাহার। কি মজা। ডেকে পাঠাল অনেককেই, পুরস্কার কিংবা সাজা শোনাল। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দিনটা কোথায় কেটে গেল, টেরই পায়নি। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন ঘুম ভাঙলো নিজের কুঁড়েঘরে। একদিনের বাদশাহ-র আবার সেই পুরনো জীবনযাপন।

এককথায় বলা যায় বাদল সরকারের 'আবু হোসেন'-এর 'বিকৃতি'টি বেশ জমজমাট। একটি বিষয় উল্লেখ্য মূল নাটকের পাগলখানাকে বাদল সরকার এখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পাগলদের কথাবার্তার মাধ্যমে নাটককার আজকের যুগের সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যা ভাবা কিংবা করা হচ্ছে সেগুলোর উপর বেশ কটাক্ষ করেছেন। যেন আজ মানুষ একটি বিশাল পাগলাখানায় বাস করছে। পঞ্চম পাগলকে স্বয়ং বাদল সরকারের মুখপাত্র বলা যায়। আর সেই সঙ্গে উঠে এসেছে পেটিবুর্জোয়া প্রোলেটারিয়াট-সর্বহারা ইত্যাদি মার্কামারা কিছু শব্দ যা একেবারেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঘোষিত শব্দবন্ধ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একদিনের বাদশাহ আবু ও তার সভাসদদের কথোপকথন উল্লেখ করতে পারি—

''সভাসদ।। হুজুর। এই একটা উদ্ভট নালিশ। এই লোকটা হোটেলওয়ারা-কাবাব কোপ্তা, তন্দুরি রুটি ইত্যাদি বেচে।

আবু।। ক্যাপিটালিস্ট।

সভাসদ।। হুজুর?

আবু।। কতো বড় হোটেল? কোন পাড়ায়?

সভাসদ।। আজ্ঞে বাজারে, ছোট হোটেল।

আবু।। বুঝেছি। পেটি বুর্জোয়া।

...

সভাসদ।। এই লোকটি একজন গরিব লোক, মুটেগিরি করে খায়।

আবু ।। প্রোলিটারিয়েট।

সভাসদ।। আজ্ঞে?

আবু ।। সর্বহারা। ...''[২০৫]

এইভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন' নাটকের বিকৃতির মধ্যে বাদল সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনটি উদ্ভাসিত হয়েছে। নাটকটি মৌলিক না হলেও নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের যে সংকটের কথা ইতিপূর্বে বেশ কিছু নাটকে উঠে এসেছে তার পরিবর্তে এখানে কিন্তু আবু হোসেন নামক এক সাধারণ মানুষকে তিনি নাটকের বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে পরবর্তীকালে বাদল সরকারের নাটকের গতিপ্রকৃতি কোন পথে প্রবাহিত হবে।

প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা নাটকের মধ্যে বাদল সরকারের শেষ নাটক '**সাগিনা মাহাতো**'।

তার কারণ ১৯৭১-এর ৮ আগস্ট, প্রসেনিয়াম মঞ্চে 'সাগিনা মাহাতো' মঞ্চস্থ করার পর আড়াই মাসের মধ্যে ২৪ অক্টোবর ১৯৭১-এ বাদল সরকার এই নাটক অঙ্গন মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি আর প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করবেন না—

> ''আমি প্রসেনিয়ামে আর নাটক করব না, আমি পুরনো ধরনের নাটক লিখবও না আর সে স্টাইলে পরিবেশনও করব না। এখন থেকে আমি যা করব তা আমার থার্ড থিয়েটারের জন্য, আমার অঙ্গন মঞ্চের জন্য। আমার নতুন থিয়েটারের ভিত্তি হবে মানুষের মন আর সরঞ্জাম হবে মানুষের শরীর।''[২০৬]

এই নাটকের কাহিনি গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' গল্প থেকে গৃহীত। এই গল্পে গৌরকিশোর ঘোষ বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা ও সংগঠন প্রক্রিয়াকে সমালোচনা করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে অন্ধ বামপন্থা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। সেই সাথে এই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে বামপন্থী রাজনৈতিক দল মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। যে কারণে স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। এই বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিক সাগিনা মাহাতোর দৃষ্টান্ত দিয়ে। সাগিনা চা বাগানের শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। মালিকের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে তার মতো করে প্রতিবাদ জানায়। ক্রমশ একজন প্রতিবাদী শ্রমিক নেতা হিসেবে উঠে আসে সাগিনা মাহাতো। কমিউনিস্ট পার্টির সুনজরে পড়ে সাগিনা মাহাতো। কমিউন্সিট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাকে দলের সঙ্গে যুক্ত করে। শুধু তাই নয় তাকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দায়িত্বও দেওয়া হয়। সাগিনা মাহাতো এতদিন নিজের মতো করে মত বিনিময় করতে পারত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। শ্রমিকদের ভালো-মন্দের সঙ্গে সে তার মতো করে জড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন সে অনুভব করল সাংগঠনিক নিয়মতান্ত্রিকতা এই আন্দোলনের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছে। পার্টির নেতৃত্বের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারছে না। তার আচার-আচরণ, তার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন, তার মূলবোধ সবকিছুই যেন পার্টি লাইনে নিয়ন্ত্রিত। সাগিনা একসময় অসহ্য জ্বালায় মর্মবেদনায় ও ধিক্কারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছে। একজন স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শকে মেনে নেওয়া কখনো সম্ভব নয় এই বিষয়টি গৌরকিশোর ঘোষ এই গল্পে বলতে চেয়েছেন।

গৌরকিশোর ঘোষের এই গল্পে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে বাদল সরকারের রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা মিলে যায়। আর ঠিক এই কারণেই বাদল সরকার গৌরকিশোর ঘোষের মূল গল্পটি অবলম্বন

করে 'সাগিনা মাহাতো' নাটক রচনা করেন। বাদল সরকার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন:

> ''গৌরকিশোর ঘোষ যে ছোটগল্পটা লিখেছিল, তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভীষণ মিল আছে। আমি দেখেছি— আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা কীভাবে ওয়ার্কারদের লিডার সাজিয়ে করাপ্ট করে দিয়েছে। যারা পরে এম পি হয়ে দিল্লিতে গিয়ে নানা করাপশনে ফেঁসে গেছে, তারা যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমি তার সঙ্গে রাজনীতি করেছি। আমি নাম করব না। খুবই পরিচিত সেইসব লিডারদের তো আমি দেখেছি পার্টি কীভাবে ব্যবহার করেছে। সেই আইডেন্টিফিকেশনের জায়গা থেকেই 'সাগিনা মাহাতো' প্রযোজনা করেছি।''[২০৭]

ইতিপূর্বে আমরা বাদল সরকারের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। তাতে জেনেছি ছাত্রাবস্থায় বাদল সরকার নিজেও বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কিন্তু নানা কারণেই পার্টির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে একেবারেই সরে আসেন। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি সাম্যবাদী চেতনার দোসর হয়েও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ও সংগঠনগত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। এখানেই 'সাগিনা মাহাতো' নাটকের 'বিকৃতির' সার্থকতা। তাঁর নিজের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েই গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

২.

এবার আসা যাক তাঁর থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটকের আলোচনায়। এই পর্বে বাদল সরকার একদিকে যেমন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রচলিত ধারা থেকে তাঁর থিয়েটারকে মুক্ত করলেন, তেমনি নাটক রচনা ক্ষেত্রেও গতানুগতিক ধারাকে বর্জন করলেন। নাটকের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে আঙ্গিক তথা কাঠামো নির্মাণ— সব ক্ষেত্রেই একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই পর্বে। যে মুহূর্তে তিনি অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যকার ব্যবধান ঘোচানোর কথা ভেবেছেন, সেই মুহূর্তে বদলে গেল নাটক রচনার অভিমুখ। মঞ্চ ছেড়ে নাটক নেমে এলো দর্শকের মধ্যে । এতদিন বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য যে সমস্ত নাটক লিখেছেন, সেখানে গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী টেক্সট মুখ্য ছিল। যেখানে একজন মননশীল পাঠক দৃশ্যায়নের পরিশ্রম ব্যতিরেকেও নাটক পাঠ করে আবিষ্কার করতে পারেন বয়ানের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থাৎ নাটক ছিল অভিনয় (Play) মুখ্য।

কিন্তু থার্ড থিয়েটার পর্বে যেহেতু সরাসরি দর্শকের উদ্দেশ্যে নাটক পরিবেশিত হয় ফলে সেখানে টেক্সট অপেক্ষা তার দৃশ্যায়ন বা নাট্যায়নই (Score) মুখ্য হয়ে উঠে। নাটককারের বয়ানে এখন নির্মিত চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় অদৃশ্য দর্শক, তারাও লিখিত ভাষ্যের চরিত্র হয়ে ওঠে। এককথায় শুধু নাট্যানুষ্ঠান তথা নাট্যাভিনয়ে নয়, নাটকের জন্মমুহূর্তেই এখন উপস্থিতি দর্শক। একেই বলা যায় থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটক রচনায় মৌলিক পরিবর্তন। অবশ্য প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্বে লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে আমরা দর্শক থেকে অভিনেতা উঠে আসতে দেখেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে তা ছিল নাটকেরই দর্শক চরিত্র। আলাদাভাবে নির্দিষ্ট দর্শককে নাটকের অংশ করার কোন প্রচেষ্টা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই পর্বে যে দর্শককে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা হল, তারা সক্রিয় দর্শক। তারা নগর নাট্যের দর্শকের মত ভোক্তা, নয়, তারাও অংশগ্রহণকারী। যাকে তিনি বলেছেন রিচ্যুয়ালের অনুরূপ। যেখানে টেক্সট-এর ভিতর ঢুকে যায় দর্শক। আর এভাবেই অভিনেতা এবং দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণে নাটক হয়ে যায় একটা নাট্যানুষ্ঠান। তখন তার মধ্যে থাকে না নির্ভেজাল টেক্সট। টেক্সট অপেক্ষা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নাট্যায়ন। তৃতীয় ধারার নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাই নাট্যশৈলীর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাদল সরকারের মতে তৃতীয় ধারার থিয়েটারের ''নাটক লেখাই যাবে না নাট্যশৈলীর কথা যথেষ্ট না ভেবে। অর্থাৎ নাট্যকারকে এক্ষেত্রে নাট্যায়নের অনেকখানি ধারণা করে নিতে হবে নাটক-রচনার সময়।''[২০৮]

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, এই পর্বের নাটক অনেক বেশি রাজনৈতিক। কোন অবসাদ, কোন নিঃসঙ্গতা কিংবা অস্তিত্বহীনতা নয়, এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন পর্বের নাটকে উঠে এসেছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এই পর্বে। আমরা তাঁর এই পর্বের প্রধান কয়েকটি নাটকের আলোচনার সূত্র ধরে নাটককার বাদল সরকারের সেই ক্রমবিবর্তনটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

থার্ড থিয়েটার তথা অঙ্গনমঞ্চের জন্য লিখিত বাদল সরকারের প্রথম নাটক **'স্পার্টাকুস'**। ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি 'স্পার্টাকুস'-এর প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিনতলার অঙ্গন মঞ্চে। নাটকটি মৌলিক নয়। ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর উপন্যাসের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে তিনি নাটকটি রচনা করেন। নাটকের মুখবন্ধ অংশে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''জীবনে যে ক'টি উপন্যাস সবেচেয়ে ভালো লেগেছে, হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকুস তার মধ্যে একটি। উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ

কয়েকবার করেছি, সাহসে কুলোয় নি।

সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত 'প্রোসেনিয়ম' মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'অঙ্গনমঞ্চ' ধরলাম। 'অঙ্গনমঞ্চ' অভিনেতাকে দর্শকের কাছে নিয়ে আসে, মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। স্পার্টাকুস অঙ্গন অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা।"[২০৯]

এই প্রথম যে বাদল সরকার অন্য একটি স্পেসের কথা ভেবে নাটক রচনা করেছেন, সে কথা জানিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছে—

'' 'স্পার্টাকুস' নাটকটা লিখি প্রথম অন্য স্পেস কল্পনা করে। সেখানে প্রসেনিয়াম স্টেজের কনসেপ্টটা ছিল না। তারপর থেকে সব নাটকেই তাই।"[২১০]

কেন তিনি অঙ্গনমঞ্চের জন্য এই নাটকটাই বেছে নিলেন? কি আছে স্পার্টাকুসের কাহিনিতে? এর উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

''রোমান সাম্রাজ্যকে একেবারে গভীর থেকে কাঁপিয়ে দেওয়া দাসবিদ্রোহ নিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্টের মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাস। আর আমি যখন সেই নাটকের নতুন অঙ্গনটা প্রত্যক্ষ করলাম, ঠিক তখনই সেই বিশাল ক্যানভাস থেকে নাটক তৈরির এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফেললাম। ... কারণ একটা নাটকের প্রস্তুতির মধ্যে আসলে কোনও একটা নতুন পথের খোঁজে চলছিল ..."[২১১]

'স্পার্টাকুস'-এর বিষয় রোমান সাম্রাজ্যের দাস বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্রীতদাস স্পার্টাকুস। এই ইতিহাস কমবেশি আমাদের জানা। দাসদের সঙ্গে অমানবিক অত্যাচার করত সম্রাট ও উচ্চশ্রেণির অভিজাত রোমানরা। কোন রকম প্রতিবাদ করলেই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেত এবং কখনো কখনো মেরেও ফেলা হত। তার উপরে এই সমস্ত বন্দি ক্রীতদাসদের নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে রাজা এবং আমলারা সপারিষদ মজা উপভোগ করত। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের সে লড়াই চলতে থাকতো। এই দাসপ্রথা, দাসদের জীবনধারা, তাদের উপর অত্যাচারের ধারাবাহিক ইতিহাস পুঞ্জিভূত হতে হতে একসময় স্পার্টাকুসের নেতৃত্বে সমস্ত ক্রীতদাস একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বন্দী সব ক্রীতদাসের মুক্তি ঘটে। কিন্তু সেই মুক্তি তো আর এমনি এমনি আসেনি, বিদ্রোহ দমন করার নামে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করে সম্রাটেরা। দাসদের উপর সেই নির্মম অত্যাচার, দাসেদের বিদ্রোহ— এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে 'স্পার্টাকুস' নাটক।

সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় অভিঘাতের সময়কালে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদের ভাষা জোগানোর জন্য এর থেকে উপযুক্ত বিষয় আর কি বা হতে পারে! শাসকের হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হতে হতে এদেশের সাধারণ মানুষও যে শেষ পর্যন্ত এক সময় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হওয়ার শপথ গ্রহণ করেছে, সেই বিবরণ রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ ও মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন। তখন আর এ নাটকের কাহিনি সুদূর রোমান সাম্রাজ্যের দাসদের মুক্তির লড়াইয়ের কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এখানেই এই নাটকের সার্থকতা।

নাটকের প্রধান চরিত্র স্পার্টাকুসকে ব্যক্তিগত ভাবে নায়ক করে দেখানো হয়নি। স্পার্টাকুসকে একটা চরিত্র থেকে একটা শ্রেণিচরিত্র রূপায়িত করেছেন নাটককার। এই নাটকে একটানা কোন গল্পও নেই। নেই ঘটনার কোন নির্দিষ্ট পরম্পরা। নাটকে টুকরো টুকরো কিছু নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডদৃশ্যে বাস্তবের বিভ্রম গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ভেঙে যায় একটি নতুন চরিত্রের উপস্থিতি। বাদল সরকারের নাটকে এই প্রথমবার আসে সূত্রধার। এর আগে অনেক নাটকেই সরাসরি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছে বিশেষ কোন চরিত্র। কিন্তু সেখানে সে বলেছে তার নিজের কথা অথবা বিশেষ কোন প্রসঙ্গে তার অভিমত। মোটের উপর ওই নাটকে তার যে চরিত্র, সেই ভূমিকায় সে চিহ্নিত। কিন্তু এই নাটকে সূত্রধার আসলে লেখকেরই প্রতিনিধি অথবা প্রকারান্তরে গোটা নাট্যদলের। সে গল্প-বলিয়ে-দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সংযোগকারী অথবা ছেদক উপস্থাপনার ব্যাখ্যাকার। সূত্রধার যাতে নাটককারের প্রোটোটাইপ না হয়ে ওঠে সে কারণেই নাটকে সূত্রধার এক নয় একাধিক। এরা প্রত্যেকেই টুকরো নাট্য দৃশ্যে কোন না কোন চরিত্রে অভিনয় করে, কখনো কোন দাস অথবা ভারিনিয়া কিংবা হেলেনা। এরা যখন সূত্রধারের ভূমিকায় তখন নাটককার এদের চরিত্রের নাম ব্যবহার করেননি অথবা সূত্রধারের বয়ানে এরা কখনো নিজের কথা বলেনি। থার্ড, থিয়েটারের নাটকের এ এক অন্যতম কৌশল বৈকি।

এই নাটকে সংলাপ অপেক্ষা শারীরিক অভিনয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। যাকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভাস্কর্যপ্রতিম শরীরবিন্যাস বা নির্বস্তুক ফর্ম'[২১২]। যেখানে শব্দের ভাণ্ডারকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করে এনে একই বাণী বা বাক্য শব্দবিন্যাসকে নানাভাবে পুনরুচ্চারণ করে শারীরিক অভিব্যক্তির চিত্রকল্পে মূর্ত করা হয়। অত্যাচার ও পরিশ্রমে ক্লান্ত দাসের ঘাম ঘরে, অত্যাচারিত হতে হতে তারা একসময়ে বিদ্রোহ করে। সেখানে কোনো সংলাপ নেই, বক্তব্য বলা নেই, শুধু শরীরী অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক নানা মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে একেবারে দর্শকদের সমতলে ঘটে চলে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলি। ক্রমে অঙ্গনমঞ্চকে ঘিরে বসা

দর্শক একাত্ম হয়ে যায় দাসদের পীড়নের সঙ্গে, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''দাস, দাসের কষ্ট, দাসের বিদ্রোহ—সেটাই তো আসল স্পার্টাকুস। যেখানে বিদ্রোহটা প্রথম থেকে বেরোয় আর সেখানে কোনো স্পীচই নেই, ক্রেসেন্ডোর প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে একটা 'বাস্ট অব্ এনার্জী' আছে। একটা প্রচণ্ড শব্দ এবং ভঙ্গি ...''[২১৩]

এই নাটক প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বাদল সরকার বলেছেন—

> ''আমার প্রথম ভাষ্যটা সবটা করতে গেলে বোধ হয় চার ঘণ্টা লেগে যেত। আমরা কাজ করতে করতে ওয়র্কশপ করতে করতে, মহলা দিতে দিতে দৃশ্যগুলোর সংলাপ কমাতে কমাতে তাদের অন্যভাবে পালটে দিই—'নন-ভারবাল্ কমিউনিকেশন'-এ। এটা একটা সংঘাতিক ইন্টারেস্টিং প্রক্রিয়া।''[২১৪]

কিন্তু 'স্পার্টাকুস' যখন লিখিত ভাষ্যে পাঠকের কাছে পৌঁছায় তখন ওই নির্বাক ভাব-বিনিময় লেখ্য পাঠে নাটকের সীমাচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত কেবল প্রযোজনার অংশ নয়। থার্ড থিয়েটারের নাট্যশৈলী এভাবেই প্রভাবিত করে লিখিত নাটককে। প্লে আর স্কোর অর্থাৎ নাটক আর নাট্যায়ন-এর কাটাকুটিতে যে লিখিত বয়ানের নির্মাণ সেটিই এই থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটক। এখানে অভিনয় শিল্পীদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য— যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে 'ভারবাল কমিউনিকেশন' বদলে যায় 'নন ভারবাল'-এ। আসলে নন-ভার্বাল বা নির্বাক কমিউনিকেশনের এই টুকরো খণ্ডগুলো দর্শক অনুপ্রবেশেরই গোপন পরিসর। এই পরিসরেই নাটকে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এক ভিন্নতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণেই লিখেছেন—

> ''অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় *স্পার্টাকুস*-এই প্রথম আমি দর্শক অভিনেতার একটা অন্যতম সম্পর্কের যথার্থ স্বাদ পেলাম। ক্রীতদাসদের সঙ্গে আমার এমন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল যাতে আমিও যেন ক্রীতদাসদেরই একজন বলে নিজেকে ভাবতে পারলাম।''[২১৫]

বলা বাহুল্য অঙ্গনমঞ্চে স্পার্টাকুসের এই নাট্যায়ন সেদিন বাংলার দর্শককুলকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকর্মী দেবাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন—

> ''চারপাশে ৩ ফুট, ২ ফুট, ১ ফুট সব বসবার টেবিল। নানান উচ্চতায় বসবার স্থান। ফাঁকা স্থানগুলিতে চলছে অভিনয়। গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ। চারপাশে, মাঝে

দাসদের, রোমকদের নানান ঘটনা ঘটে চলেছে। সকলের শরীরের ছোঁয়া লাগছে দর্শকের শরীরে। দর্শকরা যেন বসে আছেন সেই সময় রোমে। ... সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।"[২১৬]

এই একই রকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন সমকালের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"... আমাদের ঘিরে, আমাদের চারপাশ দিয়ে যখন চরিত্র আনাগোনা করছে— তখন লক্ষ করলাম যে স্পার্টাকুস একজন মানুষ নয়— ... স্পার্টাকুস একটা শ্রেণি, ... একটা প্রযোজনার একটা বিশেষ ভঙ্গি, একটা প্রযোজনার একটা বিশেষ রকম যে এতভাবে আলোড়িত করতে পারে, তা আমি বুঝতে পারিনি।"[২১৭]

এমনিভাবে সেদিন বাদল সরকার 'স্পার্টাকুস' নাটকের নাট্যায়নের মধ্য দিয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। নাটক কেন করব? নাট্যের মাধ্যমে কী কথা বলব? কাদের বলব? কেন বলব? এমন সব নানা প্রশ্নের সামনে সেদিন বাংলার দর্শককূলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বলাবাহুল্য এই 'স্পার্টাকুস' নাটক থেকেই থার্ড থিয়েটারের অঙ্গন মঞ্চে বাদল সরকারের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ঘটল।

বাদল সরকার তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মধ্যে একটি অন্যতম নাটক '**মিছিল**'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪ সাল। ওই বছরই ১৪ই এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগনার রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় করে বাদল সরকারের দল শতাব্দী। এই নাটকে উঠে এসেছে সত্তরের দশকের সেই ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। চারিদিকে তখন এক ভয়াবহ অবস্থা। খুন, মৃত্যু, জিঘাংসা তখন জীবনের নিত্য সঙ্গী। শাসকের নিষ্ঠুর আক্রমণ, মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণে সেই সময় মানুষের অস্তিত্বের এক চরম সংকট। সত্তরের দশকের সেই ভয়াল উত্তাল জীবন আবর্তনের মাঝে পড়ে সবাই যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই বিপর্যয় থেকে সেদিন কেউ রেহাই পায়নি। রাষ্ট্রীয় আক্রমণ নেমে আসে সর্বস্তরের মানুষের উপর। আক্রমণ নেমে আসে লেখক শিল্পীদের উপর। কলকাতার অলিগলিতে তখন হাজার হাজার বেওয়ারিশ লাশ। এই ভয়ঙ্কর সময়কেই বাদল সরকার 'মিছিল' নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটক শুরুই হচ্ছে সত্তরের দশকের সেই অন্ধকারময় সময়কে ইঙ্গিত করে—

"এক ।। কী হোলো আলো নিভে গেলো কেন?

....

[হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হোলো যেন]

এক ।। কী হোলো কী হোলো?

দুই ।। ও রকম করে চ্যাচাঁলো কে?

তিন ।। খুন! খুন হয়েছে!

চার ।। না না গর্তে পড়েছে কেউ—

পাঁচ ।। ছুরি মেরেছে ছুরি— সাবধান!

... ...

পাঁচ ।। ছুরি মেরে লাশ সরিয়ে ফেলেছে—

... ...

পাঁচ ।। ঐ তো লাশ—

ছয় ।। ও মা গো—

কোটাল ।। (প্রচণ্ড ধমকে) চোপ!

[সবাই থেমে গেলো একসঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।"[২১৮]

কলকাতা মহানগর সত্তর এবং সত্তর পরবর্তী অভিজ্ঞতায় প্রতিনিয়ত শুনেছে এই আর্তচিৎকার। তবুও আতঙ্কের কেন্দ্র থেকে সেদিন বেরিয়ে আসতে পারেনি, কেউ-বলতে পারিনি ওই 'লাশ আমার আত্মীয়'। সেই সত্তরের দশকের উত্তাল পরিবেশে শুরু হয় 'মিছিল' নাটক। একটি ছেলে, যার নাম 'খোকা', সে বলে—

> ''আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে এখানে। আমি খুন হয়েছি। আমি! আমি! এই যে—আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি মরে গেছি। এইমাত্র। এইমাত্র খুন হয়েছি আমি। আমি খুন হলাম আজ। আমি খুন হয়েছি গতকাল। আমি খুন হয়েছি পরশু। তরশু। গত হপ্তায়। গত মাসে! গত বছর! আমি খুন হই রোজ। রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ!"[২১৯]

এই যে রোজ খুন হয়ে যাওয়া, এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। সত্তরের দশকে এরকম হাজার হাজার খোকার লাশ পাওয়া গিয়েছিল অলিতে গলিতে। নাটককার 'খোকা'র খুন হওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই বাস্তব সত্যটাকেই উন্মোচিত করেছেন। সেই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়েও বাদল সরকার 'খোকা'দের বেঁচে থাকার একটা পথের সন্ধান করেছেন। একটা পরিত্রাণের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নাটকে দেখি, এক বৃদ্ধ ও এক যুবককে। তাদের নামও 'খোকা', মৃত যুবকটির নামও খোকা। বৃদ্ধ ও খোকা সব একাকার। তারা সব হারিয়ে বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে। তারা খুঁজছে এক নতুন বাড়ি, ''পুরোনো বাড়ি নয়, অন্য বাড়ি, সত্যি বাড়ি, সত্যিকারের সত্যি বাড়ি... "।[২২০] তারা দেখতে পায় এক

সত্যিকারের মিছিল। এই মিছিল কোন রাজনৈতিক মিছিল নয়। এ মিছিল মানবের মিছিল, মানুষের জীবনের মিছিল। বাঁচার বীজমন্ত্র ভরা আছে সে মিছিলে। তাতে যে সুর শোনা যায় তা জীবনের সুর, জীবনের আনন্দের সুর, মানুষে-মানুষে ভালবাসার বন্ধনের সুর। এ নাটক একটা অদ্ভুত উন্মুক্ত ইমপ্রেশন বা প্রতীতি তৈরি করে—

> ''খোকা ।। (অল্প আশা) সত্যি বলছো? সত্যি মিছিল?
>
> বুড়ো ।। মনে হচ্ছে—সত্যি মিছিল।
>
> খোকা ।। কাদের মিছিল?
>
> বুড়ো ।। মনে হচ্ছে—মানুষের।
>
> [কোরাস মিছিল হয়ে এলো। সঙ্গে গানের সুর। আশার গান। ভবিষ্যতের গান। এ মিছিল স্বপ্নের। এ গান স্বপ্নের। বুড়ো আর খোকার স্বপ্ন। মিছিল হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। বুড়ো খোকার হাত ধরে কাছে গেলো, হাত ধরে মিছিলের সঙ্গে মিশলো, গানে কণ্ঠ মেলালো। সবাই দর্শকদের ইঙ্গিতে ডাকলো মিছিলে যোগ দিতে। যারা যোগ দিলেন, তাঁদের নিয়ে চললো মিছিল।]''[২২১]

একটা আশার বাণী দিয়ে নাটকটি এখানে শেষ হয়।

নাটকের 'মুখবন্ধ' অংশে নাটককার বলেছেন—

> ''মিছিল স্টেজে করবার নাটক নয়। খোলা মাঠে চারিপাশে দর্শক বসিয়ে অথবা কোনো বড়ো ঘরে মেঝের উপর অভিনয় করবার নাটক। ঘরে হলে দর্শকদের চেয়ার বা বেঞ্চগুলি এমন ভাবে সাজানো থাকবে যাতে গোলকধাঁধার মতো একটি পথ ঘুরে ফিরে যাবে। এই পথটিই অভিনয়ের এলাকা, পথের দুপাশে দর্শকরা বসেছেন— মিছিল দেখতে যেমন রাস্তার দুপাশে দাঁড়াতে হয়।''[২২২]

এ নেহাতই প্রযোজনার নির্দেশ নয়। নাট্যের অতি প্রয়োজনীয় লিখিত ভাষ্য। সংলাপ নির্মাণের আগেই নাটককার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন অভিনয় পরিসরের বিন্যাস কী রকম হবে। কারণ হিসেবে বাদল সরকার বলেছেন তৃতীয় ধারার থিয়েটারে 'নাট্যশৈলীর খাতিরে বিষয়বস্তু নির্বাচন নয়, বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাট্যশৈলী খোঁজা।'[২২৩] দর্শক 'মিছিল' দেখতে রাস্তার দু'পাশে না বসলে নাট্যের লিখিত ভাষ্যও দুর্বোধ্য মনে হবে। দর্শকের এই ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি না ঘটলে নাটকের ভার্বাল বা নন ভার্বাল যে কোন ভাব-বিনিময় তার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্পর্শ করতে পারবে না। আর এ কারণেই নাটকের শুরুতেই নাটককারকে কঠোর অনুশাসনে নির্দিষ্ট করে দিতে হয় অভিনয়-পরিসরের কাঙ্ক্ষিত বিন্যাস। আর এই বিন্যাসের কাঠামোয় নির্মিত হয় নাট্যের লিখিত

ভাষ্য— 'মিছিল'। তাই শুধু টেক্সট দিয়ে 'মিছিল' নাটকের মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়।

নাটকের প্রথম সংলাপে বুঝতে পারি দর্শকের মাঝে অন্ধকারে বসবার আসন খুঁজছে 'কোরাসের পাঁচটি ছেলে এবং একটি মেয়ে'। হঠাৎ আর্তচিৎকার কেউ খুন হয়ে গেল। দর্শক অর্থাৎ কোরাসের দল তাকে খুঁজে— পায় না, আসে কোটাল। জানিয়ে দেয়, 'সব মিথ্যে, সব গুজব'। এমন আঁটোসাঁটো বয়ানে নাটক বিন্যস্ত যে দর্শকের নাট্য ঘটনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। কেননা নিজস্ব পরিসরের স্বস্তি নেই দর্শকের। পরিসরে বিন্যাসে প্রথমেই তাকে অস্বস্তির মধ্যে রেখেছেন নাটককার। এরপর তিনি নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যায়নে অস্থির করে তুলেছেন দর্শককে। খুন হয়ে যাওয়া খোকা বারবার দর্শককে জিজ্ঞাসা করে কেন তারা এখনো চুপ করে আছে? 'হত্যা' এখানে ঘটমান-বর্তমান। সমগ্র নাটকই সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে কখনো বিরোধিতায় কখনো সমর্পণে। 'মিছিল' পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে না অথচ নিছক প্রতিবেদনও হয়ে ওঠে না। আজ-কাল-পরশু, প্রতিদিনের যাপনে খুন হয়ে যাওয়া 'খোকা' শুধুমাত্র এই অদ্ভুত নিস্পৃহতার কারণ জানতে চায়, কিন্তু কখনো প্রশ্ন করে না কেন তাকে খুন করা হল। কেননা এ প্রশ্নে যে ডিসকোর্স তাতে প্রয়োজন বিষয়গত ভাব-বিনিময়। বাদল সরকার এখানে একটি সত্যকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। দশর্কের একটা দায় থাকে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার। 'মিছিল' নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক কাবেরী বসু লিখেছেন—

> ''এ নাটকে কোথাও শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না নাটককার। একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেই যেন প্রতিটি দর্শককেই তিনি বলেন এই ঘটনা আমি দেখেছি—আপনারাও দেখেছেন— ... আমি পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে পাইনি—পাইনি সেই 'মিছিল' যার অপেক্ষায় রয়েছি—আমাকে কী বলবেন আপনারা—নৈরাজ্যবাদী?—বলুন—তবু শুনতে হবে আমার কথা—শুনতেই হবে কেননা আমি আপনাদেরই একজন।''[২২৪]

বলাবাহুল্য এভাবেই থার্ড থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'মিছিল'-এর লিখিত ভাষ্য নির্মাণে।

বাদল সরকার প্রথমে অঙ্গনমঞ্চ এবং সেখান থেকে যতবেশি তিনি মুক্তমঞ্চের দিকে যাচ্ছেন ততবেশি তিনি সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের উপযুক্ত বিষয় এবং আঙ্গিককেই বেছে নিয়েছেন। যাদের জন্য নাটক তাদের মতো করে উপস্থাপন করতে হলে এই ধরনের আঙ্গিককেই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। এই কারণেই বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের

মধ্যে অনেকে লোকনাট্যে প্রভাব লক্ষ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। এই আঙ্গিক দেখা গেল 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী'র মতো বেশ কিছু নাটকে। **'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী'** নাটকটি অনেকটা কবিগানের আঙ্গিক অনুসরণ করে লেখা। এই নাটকে কোন অঙ্ক দৃশ্য বিভাজন নেই। কবিগানে যেমন কবির লড়াইয়ের চাপান-উতোর থাকে তেমনি এখানেও সেই আঙ্গিকটি রয়েছে। তবে কবিগানের মতো আক্রমণের প্রতি আক্রমণের তীব্রতা নেই। কারণ বক্তব্য-বিষয় একেবারে ভিন্ন। এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র পচা ও খুড়ো। এই দুজনের চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য উঠে আসে। এদের চাপান-উতোর—

''পচা ।। .....
বলি ওহে কবিবর!
একটি কথা শুধাই তোমায় দাও দেখি উত্তর।
খুড়ো ।। একটা কেন দশটা শুধাও না!
(গান: পাঁচালীর সুর)
পচা ।। আমিও মানুষ বাবুও মানুষ দু'টোপ করে হাত দু' পা দু' চোখ তবুও কেন
আমরা ভিন্ন জাত?''[২২৫]

কবিগানের আদলে এই নাটকের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ধরনের লোকনাট্যের আঙ্গিকের মধ্যেই আসলে সমাজের শ্রেণি বৈষম্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এখানে একটি চরিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে খুড়ো। এই খুড়ো কোন সম্পর্ক বোঝাতে নয়, আসলে খুড়োর কলের মতো এই গণতন্ত্রের সিস্টেমগুলোকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। খুড়ো তাই এই সিস্টেমের সমর্থনে সাওয়াল করে, অন্যদিকে এই সিস্টেমের শিকার হয়ে পচতে থাকা অতি সাধারণ মানুষ যাকে 'পচা' বলা হয়েছে, সে তার পেটের টানে খুড়ো নামক সিস্টেমকে প্রশ্ন করে। খুড়োও তার উত্তর দেয়—

''খুড়ো ।। .....
(গান: সুর—রামপ্রসাদী)
মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।
এদের ধ্যান ধারণা নেইকো কিছুই, গণতন্ত্র তাও বোঝে না।
মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।
গণতন্ত্রে সবাই স্বাধীন, সবাই থাকে বেঁচে বর্তে,
সাধ্যি থাকলে বুদ্ধি থাকলে সবাই পারে খেতে পরতে।
যারা অবোধ, শুধু তাদের মা গো

এমন রাজ্যেও ভাত জোটে না।

মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।

খোলা বাজার আছে পড়ে স্বাধীনভাবে বেচা কেনা,"[২২৬]

খুড়ো খোলা বাজারের কথা বললেও পচারা খোলা বাজার চায় না। তারা এই সব বেচাকেনায় থাকতে চায় না। তারা বলে, ''খোলা বাজার আমাদের দরকার নেই। বাজারই দরকার নেই আমাদের! আমরাই বানাবো, আমরাই খাবো, বেচা কেনার ধার ধারবো না।"[২২৭]

বাদল সরকারের নিজস্ব দর্শনটি এখানে পচার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। বলা বাহুল্য একটা সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখায় 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী'।

বাদল সরকার একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। পরে যখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থিয়েটারে কিছু করার কথা ভেবেছেন, তখন সেই মাধ্যমেই তিনি তার দর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজের অসম বিন্যাসকে, গ্রাম-শহরের যাবতীয় অন্যায় বিভাজনকে বাদল সরকার মেনে নিতে পারেননি। নিজে কলকাতা মহানগরের নাগরিক, মধ্যবিত্তের চেতনা তার চোখে। এতদিনের নাটকগুলিতে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের কথাই বারবার উঠে এসেছে। কিন্তু এবার সেই মধ্যবিত্তের গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাওয়ার পালা। তিনি বারবার ছুটে গেলেন গ্রামে। এতদিন যা জানতেন না, এবার তিনি জানলেন। শুধু তাই নয় মধ্যবিত্তের আপাত নিরাপদ-জীবনে যারা স্বস্তিতে আছেন, তাদেরকেও তিনি জানাতে চান, যারা এখনো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে তাদের কথা। এভাবেই একদিন রচিত হল নাটক '**ভোমা**'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৬ সাল। এই নাটকটির কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> ''... *ভোমা* লেখার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এটা আমি একসঙ্গে নাটক হিসেবে লিখিইনি। আমার যে অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে নাড়া দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে, ক্ষেপিয়েছে, সেগুলো প্রায় ডায়রির মতো কতকগুলো দৃশ্যের আকারে বেরিয়ে এসেছে, বিচ্ছিন্নভাবে তিন বছরের ওপর সময় জুড়ে এই দৃশ্যগুলো আমার কাছে পড়েছিল। ... নাইজিরিয়া থেকে ফিরে এসে আমি বেকার ছিলাম, সেই সময় সপ্তাহে দেড়দিন দু-দিন করে রামচন্দ্রপুর, সিংজোল ... এই সমস্ত অঞ্চলটা বনগাঁ অঞ্চলে, ওইখানে ঘুরেছি। ... এইখানেই প্রথম গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভূমি সম্পর্ক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বলতে কী

বোঝায়, এইসব আমি প্রথম বুঝতে পারি।"[২২৮]

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা নাটক হল 'ভোমা'। আমাদের দেশের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতির মূল ভিত্তিটা কোথায়— এই বিষয়ে বাদল সরকার তাঁর নিজের মতো করে একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে কৃষিভিত্তিক একটি দেশের ভূমি সমস্যার কোন মৌলিক সমাধান না করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা যে কতটা অর্থহীন, গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। বাদল সরকারের এই ধরনের চিন্তা চেতনার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় 'ভোমা' নাটকে। এই নাটকে গল্প নেই, ধারাবাহিকতা নেই। 'যা বলার তা অভিনেতারা সরাসরি বলেন দর্শকদের, কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, সারা শরীর দিয়ে।'[২২৯] যে চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে, নাটকের সেই 'ভোমা' সম্পর্কে নাটককার জানিয়েছেন—

> "ভোম জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক গ্রামে থাকে। কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি শহরে।"[২৩০]

ভোমা আসলে গ্রামীণ, সে দেহাতি, দেশজ। সেই গ্রামকে বঞ্চিত করে গড়ে উঠেছে শহর। একদিকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, অন্যদিকে শিল্পনির্ভর নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির—এই দু'য়ের অসম বিন্যাস ও তার দ্বান্দ্বিক রূপকে নাটককার ভোমার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন—

> "এক ।। শুনুন শুনুন-আমি আজ আপনাদের একটা গল্প শোনাবো।
>
> .....
>
> একটা ছোট্ট গ্রাম, গ্রামের নাম ভাদুরিয়া, অঞ্চল শিমুলপুর, জেলা চব্বিশ পরগনা... গ্রামে আড়াইশো পরিবার, তার ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম, নব্বইটা পরিবারের কোনো জমিই নেই, তারা পরের জমিতে জন খাটে, দিনে চার টাকা মজুরি পায়। ... চার টাকা রোজের কাজ রোজ জোটে না,... আজকাল তবু নলকূপের কল্যাণে কিছু রবিশস্য গম বোরোধান হচ্ছে ... কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্প, ডিজেল মেলে না, সার মেলে না, সারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেলো, ইউরিয়া কন্ট্রোলে আগে ছিল এক টাকা পনেরো পয়সা কেজি, এখন এক টাকা পঁচানব্বই পয়সা কেজি—
>
> দুই ।। রাস্তায় জল জমছে প্রতি বছর, কলকাতা গ্রাম না শহর?
>
> তিন ।। কলকাতায় আছও কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলো না, ছি ছি ছি!

চার ।। হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু নিয়ে খালি টালবাহানা, কবে কাজ হবে?

পাঁচ ।। পাতাল রেল কলকাতায়—ভারতে প্রথম, কিন্তু হচ্ছে কই?

এক ।। ... ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু খুঁটি আছে তার আছে— আজ তিন বছর। খুঁটি হেলে গেছে, তার খুলে এনে গেরস্থ কাপড় শুকোয়! যদি ইলেকট্রিসিটি আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে— মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে সারা শিমূলপুর অঞ্চলের দশ হাজার বিঘে জমিতে—

দুই ।। দ্বিতীয় সেতু— কবে হবে?

তিন ।। স্টেডিয়াম— কবে হবে?

চার ।। পাতাল রেল— কবে হবে?"[২৩১]

গ্রামে থাকা বারো আনা লোকের সঙ্গে শহরে থাকার চার আনা লোকের আকাশ-পাতাল ব্যবধান নাটককার অনুভব করেন। বাদল সরকার নিজেও একজন মহানগরের মানুষ। মধ্যবিত্ত সেই গণ্ডিতেই এতদিন আবদ্ধ ছিলেন, জানতেন না এতোসব। 'এক' সংখ্যক চরিত্রের মতোই জেনেছেন বলে এবার তিনি জানাতে চান। আর সেখানেই 'ভোমা' একটা অবলম্বন। 'ভোমা'র গল্প একটা মোচড় এ নাটকে। তবে ''চারিপাশে যা দেখে যা শিখে যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিল নাটকের চেহারার টুকরো টুকরো ছবিতে।"[২৩২] এই টুকরো টুকরো ছবির মালায় গ্রাম-শহর সম্পর্ক বিন্যাস একটি অন্য মাত্রায় তুলে ধরেছেন নাটককার। গ্রাম-শহরের এই এলিয়েনেশনের আশ্চর্য স্বরূপটির কথা বলতে গিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''তাঁর নাটকের মধ্যে যে এলিয়েনেশনের ছবি আমরা দেখি, গ্রাম-শহরের মধ্যে যে এলিয়েনেশন আমরা দেখি, একই দেশে থেকেও আমরা যেন দূরের মানুষ হয়ে আছি; শহরের মানুষ আর গ্রামের মানুষের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। একটা ভয়ঙ্কর এলিয়েনেশন তৈরি হয়ে গেছে ... তাই বাদলদা যখন তাঁর নাটকে দূরত্বের কথা বলেন, এবং ঘনিষ্ঠ হবার জায়গাটা অনুসন্ধান করেন, তখন মনে হয় যে একটা বড়ো কাজ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে ...।"[২৩৩]

'ভোমা' নাটক এবং তার নাটককার সম্পর্কে এর থেকে আর ভালো মূল্যায়ন বোধ করি হয় না। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছেন যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর গ্যাপ। বাদল সরকার সেই গ্যাপটাকে দূর করতে চেয়েছেন। ষোলো বছর বয়সে ভোমা সুন্দরবনে বন হাসিল করতে এসেছিল। কুড়ি বছর বয়সে ভোমা তিন ঘন্টায়

একা যে গাছ ফেলতো, দু'জনকে সারাদিনে তা পারতো না। বাহাত্তর বছর বয়সে সে দু'কিলো চালের ভাত খেতে পারত। সে বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। ভোমার বাবা, মা ভাই কেউ তেতুঁলগোলা জল খেয়ে মরে গেছে, কাউকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে। ভাত নেই, চারিদিকে শুধু নোনা জল। ভোমা মিথ হয়ে ওঠে। প্রতীকী ব্যঞ্জনা পায়। বারো আনা মানুষের মনের মিথ ভোমা। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য ভোমা কথার অনুষঙ্গে 'ভূমি' বা 'ভূমা'ও আসে মনে। কেতকী কুশারী ডাইসন তাই লিখেছেন—

> ''... বাদলবাবুর বক্তব্য আমাদের চৈতন্যে fermenting yeast-এর মতো কাজ করেছে।
>
> ভোমা'য় বাদলবাবু রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহারে স্মরণীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'ভোমা কে বা কী'-এই প্রশ্নটা বারবার তুলে ধরে, নানান দিক থেকে আলোকপাত ক'রে, আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন। ভোমার অর্থ এবং স্বরূপ আমাদের মানসে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভোমাকে কখনও ভূমির কখনও ভূমার অনুষঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। ভোমা মাটির কাছাকাছি খেটে-খাওয়া প্রাকৃত মানুষ, আইরিশ কবি প্যাট্রিক কাভানা-র বিখ্যাত দীর্ঘকবিতা The Great Hunger-এর নায়ক প্যাট ম্যাগুইয়ারের মতো ভূখা মানুষ, সভ্যতার ভিত্। কখনও দর্শকদেরই চেয়ারের মাঝখানে ভিখারির গোঙানির মধ্যে তার আর্তি শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে।''[২৩৪]

ভোমা দর্শকের মনে একটা ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। ভোমার ক্ষুধা ও যন্ত্রণার ভেতর ভারতবর্ষের বিচিত্র অর্থনীতির জটিল পাকে ও শোষণে রিক্ত নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের গোটা চেহারাটা আভাসিত হয়ে ওঠে। ভোমার আর্তনাদ বস্তুত এই আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশের ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরদের আবহমানকালের আর্তনাদ। কিন্তু এই আর্তনাদই শেষ নয়। নাটককার 'ভোমা'-য় শেষ পর্যন্ত জীবনের ব্যক্তি ও অখণ্ডতার উপরেই জোর দিয়েছেন। তাই নাটকের শেষে দেখি ভোমারা আবার জেগে ওঠে, চারপাশে নানা জঙ্গল হাসিল করে তারা আবার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভোমা মনুষ্যত্বের পরাভব নয়, মনুষ্যত্বের জাগরণ। নিপীড়িত শোষিত মানুষের উত্থানের স্বপ্ন হলো 'ভোমা'। নাটককারের এই স্বর উচ্চারিত হয়েছে 'এক' সংখ্যক চরিত্রের মধ্য দিয়ে—

> ''... ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে।
> স্বপ্ন। ভোমা উঠছে। ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে,
> শান দিচ্ছে। চারিপাশে জঙ্গল। ভোমার চোখে জঙ্গল। হাত শক্ত হচ্ছে ভোমার!

সাঁড়াশি আঙুল কুড়ুলের হাতলে চেপে বসছে। ছেঁড়া চোখে বাঘমারা আগুন জ্বলে উঠছে! ভোমা উঠছে! আমরা উঠছি!"[২৩৫]

'ভোমা' নাটকের পর তৃতীয় ধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক **'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'**। নাটকটির রচনাকাল ১৯৮৬। একটি সাক্ষাৎকারে এই নাটকের রচনা প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''এই সমাজটা বলবৎ রাখার জন্য প্রথম কথা কতগুলো সত্য গোপন করা হয়।... আমাদের থিয়েটারের একটা কাজ হচ্ছে এই যে-সত্যগুলো চাপা দেওয়া হচ্ছে বা বিকৃত করা হচ্ছে বা যেখানে অর্ধ-সত্য বলা হচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করে প্রচার করা। আর একটা হচ্ছে মিথ্‌গুলো ফাইট করা। এখন এটা করতে গেলেই কিন্তু অনেকগুলো আসপেক্ট বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ জাস্ট সমাজকে বদলাও তা নয়, বিভিন্ন আসপেক্ট । একটা যেমন *সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাসে*-এ বেরিয়ে এসেছিল। কেন? কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে একটা লেখাপড়া জানা হয়তো ইউনিভারসিটি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীকেও যদি জিগ্‌গেস করা যায় আমাদের দেশে ব্রিটিশরা কী করেছিল? অত্যাচার করেছিল, শোষণ করেছিল। কিন্তু কীরকম ভাবে শোষণ করেছিল বললে তা অনেকেই জানে না।... এগুলো বেশিরভাগ লোকই জানে না। তখন মনে হল ওটা একটা আসপেক্ট, ওটা বলার দরকার আছে। তা সেটা একটা *সুখপাঠ্য* বেরোলো।"[২৩৬]

নাটককারের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি ইতিহাসের ভেতর যে সমস্ত সত্য লুক্কায়িত থাকে তিনি তা বের করে আনার তাগিদ অনুভব করেছেন। প্রচলিত ইতিহাসে যেভাবে মানুষকে অতীত জানানো হয়, তা যে সত্য নয়, তার ভেতর যে আরো গভীরতর সত্য লুক্কায়িত আছে একথাই তিনি বলতে চান। এই নাটকে মূলতঃ ব্রিটিশ পিরিয়ডকে ধরা হয়েছে। তবে ইতিহাসকে নাটকের ভিতর দিয়ে জানাতে গেলে তার আঙ্গিক যায় বদলে। শিক্ষক ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন— এভাবেই শুরু হয় নাটক। জনগণকে ইতিহাস জানানো মূল উদ্দেশ্য বলে নাটকে দর্শকদের ক্লাসের অংশ করে নেওয়া হয়েছে। কোন টিকিট কাটা দর্শক নয়, সর্বসাধারণ এখানে দর্শক। যেমন একটি ক্লাসে ফাস্ট পিরিয়ড, সেকেণ্ড পিরিয়ড থাকে নাটকেও তিনটি পিরিয়ড রয়েছে। ক্লাসের এই তিনটি পিরিয়ডে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। আবার তিন দিকের দর্শকদের তিনটি ক্লাসের ছাত্র বলে ভাবা হচ্ছে। বাদল সরকার মঞ্চ নির্দেশনায় স্পষ্ট করে

বলেছেন—

> ''এ নাটক প্রচলিত মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নয়। খোলা মাঠে অথবা ঘরের মেঝেতে অভিনয় করতে হয়। দর্শকরা বসবেন অ্যারিনার মোটামুটি তিন দিকে। চতুর্থ দিকে একটি প্ল্যাটফর্ম, তার দু'পাশ থেকে প্রবেশ পথ। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একটি পর্দা বা পার্টিশন, যার আড়াল থেকে সরাসরি প্লাটফর্মে প্রবেশ করা যায়।
>
> তিন দিকের দর্শক যেন তিনটি ক্লাসের ছাত্র। প্রতি ক্লাসে কমপক্ষে দু'জন করে অভিনেতা ছাত্রের ভূমিকায়— দর্শকদের প্রথম সারিতে বসা গোড়া থেকেই।''[২৩৭]

নাটককারের মঞ্চ নির্দেশনায় দেখা যাচ্ছে, থার্ড থিয়েটারের আঙ্গিকে জনগণকে থিয়েটারের অংশ করে নিয়েই তাদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস জানানো হচ্ছে। নির্মাণশৈলীর দিক থেকে এই নাটকের বিষয়কে এভাবেই তুলে এনেছেন নাটককার। নাটকে দেখা যায় ক্লাসে ফার্স্ট পিরিয়ড হবে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট পিরিয়ড অর্থাৎ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া।

> ''শি-২।। স্যার, কোন্ পিরিয়ড্?
>
> কর্তা ।। ফার্স্ট পিরিয়ড্।
>
> শি-৩ ।। না স্যার, ভারতের ইতিহাসের কোন্ পিরিয়ড্?
>
> কর্তা ।। ডার্ক পিরিয়ড। অন্ধকার যুগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। কিন্তু ইন্ডিয়ার ইতিহাসের?
>
> কোন্ পিরিয়ড্? কে বলতে পারে?
>
> শিক্ষকরা ।। স্যার, ফার্স্ট পিরিয়ড্।
>
> কর্তা ।। রাইট। গুড্ টিচার্স। ইন্ডিয়ার ফার্স্ট পিরিয়ড্। নাও-টু ক্লাস!''[২৩৮]

এখানে ভারতের নয় ইণ্ডিয়ার ইতিহাসকে ফার্স্ট পিরিয়ড বলা হচ্ছে। যেন বলতে চাওয়া হচ্ছে যে ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকছে না। ব্রিটিশদের দখলে ইণ্ডিয়া হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত বাণিজ্য করতে আসার সময়কে ধরা হচ্ছে। ইংরেজ ফরাসি ওলান্দাজ, পর্তুগিজরা যখন বাণিজ্য করতে আসে তখন ভারতবর্ষ নিজস্ব শিল্পে সমৃদ্ধ। চাষের জমির মালিক ব্যক্তি নয়, গ্রাম সমাজ। গ্রামে কুটির শিল্পী হিসেবে ছিলেন—তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, কাঁসারি, স্যাকরা ইত্যাদি। গ্রামের খাদ্য, গ্রামের সব কিছু গ্রামেই হতো। এককথায় সেই সময় ভারতবর্ষের গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। কিন্তু যেদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল সেদিন থেকে গ্রাম-শহরের মধ্যে তৈরি হলো অন্যায় বিভাজন। গ্রাম-শহরের এই অন্যায় বিভাজনের কথা বাদল সরকার ইতিপূর্বেও 'ভোমা' নাটকে

বলেছেন। এই নাটকে যেন ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনে তার একটা কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকেও ভূমি, ভূমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কের কথা এসেছে।

ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া হওয়ার ইতিহাসের সূত্রে চলে আসে বিশ্বের ইতিহাসের অনিবার্য প্রেক্ষাপট। বণিক শাসক হয়ে যায়। বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি তাদের হাতে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনার উর্ধ্বসীমা চৌত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়। একদিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব, আমাদের দেশে তখন চলছে মন্বন্তর। ভারত লুটের টাকায় পুঁজি জমলো ব্রিটেনে, হলো শিল্প। এই পর্বটিকে নাটককার বলেছেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সেকেন্ড পিরিয়ড—

> ''হিস্টোরি অফ্ ব্রিটিশ হিন্ডিয়া। সেকেন্ড পিরিয়ড। মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল ইজ্ রিপ্লেস্ড্ বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল।''[২৩৯]

এভাবেই ইতিহাসকে দেখেছেন বাদল সরকার। যে শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে হলো তার জন্য বাজার চাই। ভারতের মতো উপনিবেশে বাজার দখল করতে হলে ভারতবর্ষীয় শিল্পকে ধ্বংস করতে হবে। ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ করতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ—

> ''ব্রিটানিয়া।। ... উহারা চাষ করিবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই ইতিহাস।
> কর্তা ।। সে কি কথা? কৃষি-প্রধান?
> ব্রিটানিয়া ।। হ্যাঁ, এই ইতিহাস। আজ হইতে। কালক্রমে ভারতবাসীরাও তাহা বিশ্বাস করিবে।''[২৪০]

এর ফলে যে ইতিহাস নির্মিত হলো তা হল ভয়াবহ। ভারতের কুটির শিল্পীরা বেকার হলো। সমস্ত জাতিই চাষের দিকে গেল। জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জমিদার নামক এক দারুণ কল তৈরি করে মুনাফা লুটতে শুরু করল। স্যাকরা, কামার, কুমোর সবাই চাষি। শিল্পের বাজার দখল করল ব্রিটিশ। সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে গেল শিল্পজাত দ্রব্য। সংযোগ মাধ্যম প্রয়োজন হলে তৈরি হল রেলপথ। এভাবেই এল বাণিজ্যের প্রসার। এই পর্বকে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন থার্ড পিরিয়ড্ হিসেবে— ''হিস্টোরি থার্ড পিরিয়ড্। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল চেঞ্জিং টু ফিন্যান্স ক্যাপিটাল।''[২৪১] এর ফলে বাংলার বুকে নেমে এলো ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার মায়ের কোল খালি হলো।

> ''মা ।। ... ছিয়াত্তরে গেল এক কোটি খোকা। তারপর এক শ পঁচিশ বছরে একত্রিশটা দুর্ভিক্ষ। তাতে মরেছে কম করে তিন কোটি খোকা। ... শুধু খাজনা খাজনা খাজনা। আর খোকা শুধু মরছে মরছে মরছে।''[২৪২]

ভারতে তখন ব্রিটেনের মহারানীর রাজত্ব। নয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। বাজার দখলের প্রতিযোগিতা। ফল মনোপলি ক্যাপিটাল। নাটকে ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের কথাও

এসেছে। যে বিপ্লব পুঁজিবাদের অবসান চেয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। কারণ হিসেবে বাদল সরকার বলেছেন— ''পুঁজি দুনিয়াতে এসেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত আর পুঁজ মেখে!''[২৪৩] উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে গেল কিন্তু এই পুঁজিকে বাঁচিয়ে রেখেই। এখানেই আমাদের ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি তৈরি হলো। আমরা আমাদের যে ইতিহাস পড়ি তা অনেকটা সুখে পড়ি। 'সুখপাঠ্য' হয়ে ওঠে ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে এখানে কষাঘাত করা হয়েছে অন্য ইতিহাসের প্রকৃত ইতিহাস এনে। সে ইতিহাস সুখে নয়, অসুখে পরিপূর্ণ। এটাই নাটকের মূল বক্তব্য। এইভাবে একদিকে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ঘাটন, অন্যদিকে সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম-নিষ্ঠুর দিকটি নাটককার এই নাটকে তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় একজন শিল্পীর ইতিহাস চেতনার এক অসাধারণ দলিল 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'।

বাদল সরকার সবসময় শ্রেণিবৈষম্যহীন এক সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেন। এই চিন্তা ধারার একটি অন্যতম নাটক **'হট্টমালার ওপারে'**। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৭। নাটকের কাহিনি লীলা মজুমদার এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোর উপন্যাস 'হট্টমালার দেশে' থেকে লিখিত। নাটকের মুখবন্ধ অংশে সে কথা জানিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা মজুমদারের যৌথ-ভাবে রচিত কিশোর উপন্যাস 'হট্টমালার দেশে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়। পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা হাতে এসেছিল, মাঝখানে দু'একটি সংখ্যা বাদ, শেষটা একেবারেই পাইনি। এই অসম্পূর্ণ পাঠ 'হট্টমালার ওপারে' নাটকটির প্রেরণা।''[২৪৪]

নাটককার নাটকটি লেখার প্রেরণাটুকুই পেয়েছেন। মূল কাহিনি গ্রহণ করলেও ভাবনা এবং বক্তব্য তার নিজস্ব। এই নাটকে একটা টানা গল্প বা কাহিনি আছে। বলা ভালো নাটকটি মূলতঃ কাহিনিপ্রধান। নাটককারের সহজাত স্বভাবধর্ম অনুযায়ী গল্পের গাঁথুনির মধ্যে দিয়েই মজা সৃষ্টি করেছেন। আর মজা করতে করতেই তিনি তাঁর বক্তব্যের কিনারে পৌঁছাবার চেষ্টা করে গেছেন। একটা রূপকের আদলে নাটককার তাঁর মূল ভাবনা বা বক্তব্য তুলে ধরেছেন। একদিকে গল্পের মজা এবং অন্যদিকে নাটককারের বক্তব্য— এ দুটির মধ্যে অসম্ভব সমন্বয় রেখে নাটকের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে দর্শক বা পাঠক দুটোই সমানভাবে উপভোগ করেছেন। কী আছে এই নাটকে? চুরি করে বেড়ায় দুটি চোর। চুরি করা তাদের স্বভাব নয়, অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই

তারা চুরি করে। একবার চুরি করতে গিয়ে তাদের প্রায় ধরা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। লোকের তাড়া খেয়ে কোনোক্রমে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সেবার প্রাণ বেঁচে যায়। নদী পার হয়ে তাদের খেয়াল হয়, তারা এক অজানা দেশে এসে পড়েছে। হট্টমালার যে দেশে তারা এতোদিন বাস করেছে, এই অজানা দেশটি সেরকম নয়। এইরকম দেশ তারা এর আগে কখনও দেখেনি। এই অজানা দেশটিতে আইনের কোনো কড়াকড়ি নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে কোন বিধির বাঁধন নেই, প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়ানো যায় এখানে। কোন বেড়াজালে আটকে পড়ার আশঙ্কা নেই। দেশটিতে সব খোলামেলা। খাওয়া-পড়ার কোনো অভাব নেই। সুতরাং চুরি করারও কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে সকলকেই কাজ করতে হয়—

> ''ডাক্তার।। ... আমরা সবাই কাজ করি, সাধ্যমতো কাজ করি। তাই সবাই দরকারমতো সব কিছু পাই। কাজ না করলে কিছুই পেতাম না।''[২৪৫]

হট্টমালার ওপারের অজানা দেশটির সবাই আনন্দের সঙ্গে কাজ করে। ফলে খাওয়া-পরার জন্য হট্টমালার দেশের মতো উঞ্ছবৃত্তি করার দরকার পড়ে না। তারা তাদের মত শ্রম দেয়। বিনিময়ে খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়, স্বাস্থ্য-শিক্ষা—সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যায়। দেশটিতে তাই মুদ্রা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মুদ্রাসঞ্চয় এবং ধনবৃদ্ধি বা বঞ্চনার কোন ব্যাপার নেই। সবকিছুতে সবার সমান অধিকার। বাঁধনহীন খোলামেলা এই দেশে চোর দুটি প্রাণের আনন্দে বাস করতে থাকে। এই হলো নাটকের কাহিনি।

আপাতত ভাবে নাটকের এই কাহিনি হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'সব পেয়েছির দেশ'। আসলে এই কাহিনির রূপকে বাদল সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন সেটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে দেশের কথা এখানে বলেছেন তা হল কল্পনার রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক। নাটককার কল্পনায় সেই স্বপ্নের দেশের গল্প বলেন। এপারের দেশের ব্যবস্থাই একজন মানুষকে চোর হতে বাধ্য করে। হট্টমালার ওপারের দেশে পৌঁছে গেলে আর চৌর্যবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। চোর দুটি স্বপ্নে সেই দেশে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে সেই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব? সেটিও নাটককার সাঁতার কাটার রূপকের দ্যোতনায় বলেছেন। অনেক বাধা-বিপত্তি এবং সংগ্রাম-লড়াই-মেহনত পেরিয়ে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে তবে সে দেশে পৌঁছানো যেতে পারে। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নাটককারের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বটে। নাটককারের বক্তব্য হল, মানুষের ইতিহাস যদি শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস হয়, তাহলে কোন সংগ্রাম ছাড়াই শ্রেণিহীন সমাজে পৌঁছানো যায় না। নাটককার এখানে এই শ্রেণিহীন সমাজ গঠনেরই স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সাম্যবাদের। আর সেখানে তাঁর নাটকই হয়েছে অন্যতম হাতিয়ার। 'হট্টমালার ওপারে' নাটক তাঁর সেই সাম্যবাদী চেতনা বহিঃপ্রকাশ।

বাদল সরকারের নাটকগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় একদিকে যেমন তিনি মৌলিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি, যখন যেমন প্রয়োজন মনে করেছেন বহু বিদেশি নাটকও বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চায়ন করেছেন। এই জাতীয় একটি নাটক হলো **'গণ্ডী'**। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৯ সাল। 'গণ্ডী' একটি অনুবাদ মূলক নাটক। অবশ্য বাদল সরকার অনুবাদ না বলে একে ভাষান্তর বলেছেন। মূল নাটক বের্টোল্ট্ ব্রেশ্‌টে-এর 'দ্য ককেশিয়ান চক্ সার্ক্‌ল্'। বাদল সরকার এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

> '' 'গণ্ডী' নিয়ে একটা নতুন পথ চলা শুরু হল। যেহেতু বিষয়বস্তুই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাই যে সূত্র থেকেই হোক, ভারতীয় বা বিদেশী, সেটা নেওয়ায় আমাদের কোনও বিবেকযন্ত্রণা ছিল না (এবং এখনও নেই)। অবশ্য সেটাকে আমাদের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ... ব্রেশটের নাটক করব বলেই এটা করা নয়, আমি দেখলাম, এটা একই সঙ্গে ভারতীয় ও সমকালীন।''[২৪৬]

নাটকটিতে কোন 'অঙ্ক', 'দৃশ্য' বিভাজন নেই। অবশ্য থার্ড থিয়েটার পর্বের প্রায় সব নাটকেই নাটককার সচেতনভাবে 'অংক', 'দৃশ্য' বিভাজনের প্রথাগত ধারণা থেকে সরে এসেছেন। নাটকটির মূল বার্তা হলো, যে মা শিশুটিকে ভালোবাসবে তারই শিশুটিকে পাওয়া উচিত। মায়ের শিশুর প্রতি অধিকারের এই তুলনায় নাটকে চলে আসে ভূমির প্রতি কৃষকের অধিকারের প্রশ্ন। যে অধিকারের প্রসঙ্গ আমরা 'ভোমা' নাটকে উত্থাপিত হতে দেখেছি। এই নাটকে আবার সেই অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন সাধারণ দর্শকের সামনে। যে কৃষক জমি চাষ করে তারই সেই জমিতে অধিকার থাকা উচিত। এটিই নাটকের মূল বক্তব্য। নাটকটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট—

> ''এই কথাটা যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিকদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া খুব দরকার, তাই নাটকটা সমকালীন ও ভারতীয়—আমার এই ধারণাটা সমর্থন পেল।''[২৪৭]

নাটক কেবল একজন রচনা করবেন আর দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করবেন সেই ধারণা থেকেও বাদল সরকার এই পর্বে বেরিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সমবেতভাবে নাটক রচনার ধারণাও এই পর্বে উঠে এলো। **'বাসি খবর'** নাটক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলের অন্যান্য সদস্যদের মিলিত কাজের ভিত্তিতে তৈরি হয় 'বাসি খবর'। নাটকের

মুখবন্ধে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

> '' 'বাসি খবর' নাটকটি শতাব্দীর মিলিত কাজের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ, মিলিত আলোচনায়, মিলিত চেষ্টায় হয়েছে। অবশেষে সেই মিলিত চেষ্টার ফলটাকে আমি নাটকের আকারে লিখেছি।''[২৪৮]

এই নাটকের বিষয়ও নির্দিষ্ট কিছু নয়। বাদল সরকারের অন্যান্য অনেক নাটকের মতো এখানেও ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ, রাজনীতি শ্রমিক স্বার্থের কথা আছে। এই নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে ইতিহাসের ঘটে যাওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে সাঁওতালদের নিজস্ব ভূমি থেকে উৎঘাত হতে হয়েছিল। শুধু ব্রিটিশরাই নয় এদেশের জমিদার, মহাজন, ও মালিক শ্রেণিরা ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাঁওতালদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য। ইতিহাসের সেই ঘটনার হাত ধরে তিনি ফিরে যান আদিবাসী সমাজের কাছে। এই নাটকে সাঁওতাল শব্দ 'হুল' অর্থাৎ বিপ্লবকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন মাত্রা দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। 'দিকু' অর্থাৎ বাবু তথা শোষকের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা ও বিপ্লব করার ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলতে চান যে, বিদ্রোহ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ইতিহাস সচেতন নাটককার তাঁর নাটকে বিভিন্ন দিকের ইতিহাস তুলে আনেন। কৃষি সভ্যতায় আদিবাসীদের অবদানের কথা বলেন। যে আদিবাসীরা ভূমির আসল মালিক তারাই আজ বঞ্চিত। এই নাটকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষের শোষণ-বঞ্চনার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহের কথাও তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। বাদল সরকার এই নাটকে তথ্যসহকারে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

নাটকার বাদল সরকার এখানে সংক্ষেপে সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সেই বিদ্রোহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—''শোষণ অত্যাচার অবিচার থেকেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।... সাঁওতাল পরগণার ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য থেকে বার হয়ে এলো ঐতিহাসিক সাঁওতাল হুলের নায়ক সিধো, কান্‌হো, চান্‌রায়, ভৈরো।''[২৪৯]

১৮৫৫ সালে ৩০ শে জুন সাঁওতাল হুলের আগুন দাবাগ্নির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। সেদিন ভাগনাডিহি গ্রামে জমা হয়েছিল চারশো গ্রামের প্রতিনিধিসহ দশ হাজার সাঁওতাল। অত্যাচারী কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, জমিদারদের চরমপত্র দেয় তারা। ১৬ই জুলাই ভাগলপুর জেলার পিয়ালপুরে কাছে পীরপাঁইতি ময়দানে বন্দুক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। বন্দুক বাহিনী তীর-ধনুকের কাছে হার মানে। কিন্তু এরপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। গণহত্যা শুরু হয়। 'এক' সংখ্যক চরিত্রের

সংলাপ উঠে আসে সেই ভয়াবহ ইতিহাস—

''এক ।। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের উপর দিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার তাণ্ডব চললো। হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক বৃদ্ধ নারী শিশু প্রাণ হারালো। পঞ্চাশটি হাতিকে উন্মত্ত করে ছেড়ে দেওয়া হলো, তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হোলো গ্রামের পর গ্রামের সাঁওতাল নরনারী, ধূলিসাৎ হোলো শতসহস্র কুটির!''[২৫০]

সাঁওতালরা কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ করেনি। সবাই প্রাণ দিয়েছে না হয় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ধরা পড়েছে। সংগ্রামের স্পিরিট দেখানোই নাটককারের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই ইতিহাস খুবই পরিচিত। লেখক এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতির ইতিহাসটিকে তুলে আনতে চান। ইতিহাসকে তিনি নাটকের মোচড়ে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান—

''...সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলো যে যারা অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মেলামেশা হলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে পড়বে।

.....

সুতরাং সাঁওতালদের ভারতের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করা হোলো।''[২৫১]

এই যে সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস, এটা একদিন থেকে 'বাসি', '... এ সব অনেকদিন আগে হয়ে গেছে!'[২৫২] কিন্তু বাসি নয় নাটককারের সমকাল। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সত্তরের দশক। তাই নাটকে দেখা যায় একজন, ব্রিটিশের অত্যাচার নিপীড়নের বর্ণনা করে, অন্যজন সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আক্রমণের কথা বলে চলে। দু'টি কাহিনি সমান্তরাল থেকে শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের ধারাবাহিক ইতিহাসটিকে নাটককার তুলে ধরেন।

''তিন।। ১৯৭৮ সালের প্রথম ন'মাসে হরিজনদের উপর অত্যাচারের ঘটনা সংখ্যা ৩ হাজার ১৯।

.....

পাঁচ।। উত্তর প্রদেশের পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৮, ১৩ই এপ্রিল ৫০০ শ্রমিকের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ সামনে ও পিছনে পথ বন্ধ করে গুলি চালায়। ... মৃতদেহগুলি একটি আখের ক্ষেতে জড়ো করে

আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

.....

এক।। ১৯৭১ আগস্টে বরানগরে পুলিশের আনুকূল্যে দু'দিনের দেড়শ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপরে পড়ে ছিল। পরে সেগুলি রিক্সা আর ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে গিয়ে হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ...

.....

তিন।। ১৯৭১ জানুয়ারিতে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায় ছ'টি মৃতদেহ। ... ১৯৭১ জুনে কোন্নগরে মাটি খুঁড়ে ন'টি মৃতদেহ বার করা হয়। প্রায় সব কটির মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল।"[২৫৩]

এই 'খবরগুলি' টাটকা। আসলে বিদ্রোহ-বিপ্লব কখনো বাসি হয় না। ফুরিয়ে বা হারিয়ে যায় না। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে যে-কোন মুক্তির লড়াই-ই টাটকা খবর। আর এদিক থেকে অতীতের সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের এবং তাদের সংগ্রামের ইতিহাসও টাটকা। সেখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দুই শতকের দুটি ঘটনা একাকার হয়ে যায়। নাটককার দেখাতে চাইছেন যে, শাসক বদলালেও শোষণ ও অত্যাচারের চেহারা খুব একটা বদলায় না। সুতরাং সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো একটা বিদ্রোহের স্পিরিট প্রয়োজন। জীবন দিয়ে তাদের অদম্য লড়াই এবং কঠিন পণকে সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের স্মরণ করাতে চেয়েছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বিপ্লব প্রয়োজন। নাটককারের বক্তব্য নাটকের শেষে 'এক' সংখ্যক চরিত্রের সংলাপ স্পষ্ট—

> ''মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটছে আর কী ঘটবে, সবাই জানে। এখনো চিৎকার করে উঠছে না কেন? সময় কি আসেনি? আসেনি?"[২৫৪]

এইভাবে একটা প্রতিরোধ, সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে নাটকটি শেষ হয়।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে বাদল সরকারের নাটক যে চমকপ্রদক এবং প্রথা বহির্ভূত সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, ''বাংলা নাটক একই রাস্তায় চলে না, একই পথে চলে না, বাংলা নাটকও নাটকের ভাঙা পথ আবিষ্কার করতে পারে, নানা মাত্রা দেখাতে পারে।"[২৫৫] এটা ঠিক যে, একটা সময় পর্যন্ত তাঁর নাটক নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যার বৃত্তে আবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন, মধ্যবিত্ত জীবনের

একঘেঁয়েমি এবং তার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, বেদনাকে, স্বপ্নকে, আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মধ্যবিত্তের বৃত্তকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। নাটক ক্রমশ হয়ে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনের, তাদের অধিকারের, তাদের সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে তাঁর নাটকে আমরা বেঁধে ফেলতে পারি না। এককথায় আমরা বলতে পারি না যে তাঁর নাটক বড় বেশি মধ্যবিত্তের। যদিও বাদল সরকার সম্পর্কে এরকম ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকেন। এর একটা অন্যতম কারণ বাদল সরকারের 'পাখিরা উড়ে যায়' শীর্ষক তথ্যচিত্রে তাঁর নিজের একটি স্বগোক্তি—

> ''... আমি কলকাতা মহানগরের নাগরিক। আমার চেতনার চোখে যত ছবি ভাসে, তার পনেরো আনা নগরচিত্র।''[২৫৬]

বাদল সরকারের এই কথার সূত্র ধরেই অনেকে তাঁকে নাগরিক জীবনের নাটককার বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাদল সরকারের নাটকের কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে মণিপুরি নাট্যনির্দেশক হৈস্নাম কানহাইলাল বলেছেন—

> ''বাদলদার সীমাবদ্ধতা নগরবদ্ধ চেতনা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতায়। এই চেতনা থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চান, কিন্তু পারেন না, তারই মধ্যে আবদ্ধ থেকে যান। ... তিনি আটকে আছেন তাঁর সেই নগরবদ্ধ চেতনায়, ... ''[২৫৭]

কিন্তু সত্যি কি তাই? বাদল সরকারের নাটক সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথাযথ নয় বলেই আমাদের মনে হয়। কারণ 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস'-এর মধ্যবিত্ত গণ্ডিকে অতিক্রম করে বাদল সরকার শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছেন 'ভোমা'-র মতো গ্রামীণ ভারতবর্ষে। বাদল সরকার একজন নগরের মানুষ। ফলে তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত জীবন ও তার সংকট উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের চেতনায় বাদল সরকার আটকে থাকেননি। একদিন শুনলেন 'ভোমা'র কথা, দেখলেন 'ভোমা'-কে বাস্তবে। একথা যেমন তাঁর থিয়েটার নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সত্য। যেকোনো স্রষ্টাই অভিজ্ঞতার ক্রম সম্পূর্ণতার পথে চলতে চলতে তাঁদের সৃষ্টির এক পরিণতির দিকে এগোতে থাকেন। বাদল সরকার এর ব্যতিক্রম নয়। একটু একটু করে তিনি এগিয়েছেন সম্পূর্ণতার দিকে। তৈরি করেছেন নিজের ভূমি।

বাদল সরকারের নাটক, বিশেষ করে তাঁর থার্ড থিয়েটার পর্বের নাটক সম্পর্কে বলা হয় তাঁর নাটকে সংলাপের বড় অভাব। অর্থাৎ তিনি তার দর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে কোন সংলাপে জড়াতে অস্বীকার করেছেন। এটা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, এর কারণ তিনি প্রথাগত আখ্যানকে স্বীকার করেন নি। তাঁর প্রথম পর্বের হালকা কৌতুক নাটকগুলির কথা বাদ দিলে, পরবর্তী পর্বের প্রায় সব

নাটকেই আখ্যানকে অস্বীকার করা হয়েছে। নাটকে তিনি কথার অর্থে বিশ্বাস করেননি। তিনি সংলাপ অপেক্ষা শরীরের ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে চেয়েছেন 'ঘনিষ্ঠ' থিয়েটারে। তাই এই প্রথাগত সংলাপহীনতা তাঁর রচনার দুর্বলতা নয়, বরং এটা তাঁর নাট্যআঙ্গিক পরিকল্পনারই অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে আমরা তামিল নাট্য নির্দেশক প্রসন্ন রামস্বামী -র গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন—

> ''বাদল সরকার এক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই শব্দকে বর্জন করেন। ... তিনি যখন তাঁর থিয়েটারকে 'দারিদ্র থিয়েটার' অভিধা দেন, তখন তিনি ইঙ্গিত করেছেন তাঁর সংরূপের প্রতি। তাঁর সংরূপ বলতে আখ্যান, অর্থ ও টেক্সট বিরহিত এক রিক্ত সংরূপ।''[২৫৮]

তবে তাঁর নাটকে প্রথাগত সংলাপ একেবারেই নেই এটাও ঠিক নয়। একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারা যায় এক অনুপম নির্মেদ সংলাপের ঝরঝরে বিন্যাসে এগিয়ে যায় তাঁর নাটকের কাহিনি। বাদল সরকারের সেই সহজ অথচ বিস্ময়কর মুন্সিয়ানা তাঁর প্রতিটি নাটকেই বিদ্যমান। বাদল সরকার তাঁর নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন কবিতার সংলাপে। শব্দের বুননে, বাচন-ভঙ্গিমায়, চিত্রকল্পের ভিন্নতায় তাঁর নাটকের সংলাপ অপূর্ব কাব্যময় হয়ে উঠেছে। সংলাপের এই কাব্যময়তা কেবল প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লিখিত নাটকে বিদ্যমান, আর মুক্তমঞ্চের জন্য লিখিত নাটকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এমন নয়। নাট্য সমালোচক ভবেশ দাস যথার্থই বলেছেন—

> ''... তিনি (বাদল বাবু) যখন 'প্রচলিত' মঞ্চের মায়া কাটিয়ে তৃতীয় ধারার নাট্যের খোলা আকাশের নিচে মুক্ত আঙিনায় নেমে এলেন তখনও বিভিন্ন নাটকের সংলাপে বেজে চলেছে কবিতার ধ্বনি।''[২৫৯]

আসলে থিয়েটারে কবিতা যখন অচল বলে বিবেচিত হয়ে গেছে তখন প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভর করে বাদল সরকার কবিতায় নাটকীয় একভাষণ রচনা করেছেন। বাংলা থিয়েটারের এই জাতীয় একভাষণের যে পরম্পরা ছিল, আসলে তাকেই তিনি ফিরিয়ে এনেছেন, তবে সম্পূর্ণ অন্য লক্ষ সাধনে, অন্য আঙ্গিকে, যা দৈনন্দিন ভাষার কাছাকাছি। গদ্য সংলাপ থেকে কাব্যে হঠাৎ স্বরান্তর চরিত্রের মেজাজ ও অনুভবের পর্বান্তরের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাদল সরকারের নাটক সংলাপহীন, এরকম সিদ্ধান্তে আসা যথার্থ নয় বলেই আমরা মনে করি।

বাদল সরকার নাটকের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রথাগত ধারণাকে ভেঙেছেন। তিনি মনস্তত্ত্বজারিত পূর্ণায়ত চরিত্র চিত্রণের লক্ষ্যে থেকেই সংশয়ের সঞ্চার করেছেন। অমল, বিমল, কমল কি তিনজন স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাকি বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দৃষ্ট একই

ব্যক্তি? কিংবা মানসী, কিংবা শরদিন্দু, সীতানাথ, বাসন্তী, কণা, 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের মেয়েটা? তারা বরাবরই একই চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। এক একটা মুহূর্তে অনুপুঙ্খ ভাবে তাদের স্পষ্ট চেনা যায়। আবার তারা ফোকাস-এর বাইরে চলে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়। কোন ব্যক্তির সত্তাপরিচয় যে কখনই নির্দিষ্ট করে বেঁধে ফেলা যায় না, তা যে ক্রমাগত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এখানেই বাদল সরকারের চরিত্র নির্মাণে স্বাতন্ত্র্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাদল সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান। নিজের জীবন এবং নাট্যচর্চায় তো বটেই তাঁর নাটকেও রাজনৈতিক দলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার ঘটনাটিকে তিনি নস্যাৎ করেছেন বারবার। রাজনৈতিক দর্শক থেকে তিনি বিচ্যুত হন না কখনও, কিন্তু দর্শনের দলচরবৃত্তি তাঁর কাছে সর্বাগ্রে পরিতাজ্য। তাই দেখা যায়, তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হলেও নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের মতামত সেখানে প্রাধান্য পায় নি। তার কারণ বাদল সরকারের কাছে রাজনীতি কথাটার মানে হলো একটা দর্শন, যা প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে। তাঁর জীবন দর্শনই তাঁর রাজনীতি। বাদল সরকার সেই ভাবেই তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন।

বাদল সরকারের নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে তাঁর বেশকিছু নাটকের বিষয় অস্তিত্ববাদ। যার অভ্যন্তরে রয়েছে জীবনের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা এবং অর্থহীনতা। এক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া হয় তাঁর ষাটের দশকে লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলা ঘোড়া'-র মতো নাটকের। যেমন দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

> ''তাঁর নাটক পড়তে পড়তে বা অভিনয় দেখতে দেখতে প্রাথমিকভাবে একটা আশাবাদী দর্শন বা বক্তব্য আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, তাঁর নাটকে আশাবাদী বক্তব্যের আড়ালে নেতিবাদী জীবনদর্শনই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। অনেককেই তা হতাশ করেছে।''[২৬০]

আমরা কিন্তু এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হতে পারছি না। আধুনিক চিন্তায় অর্থহীনতার দর্শন কিন্তু কোনোভাবেই ভীরুতার সমার্থক নয়। আসলে এর মূলে আছে নেতিবাচক এক রুক্ষতা রূঢ়তা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কাম্যুর 'আউটসাইডার' লেখা হয়েছিল। নির্দয় ধ্বংলীলা উপন্যাসের সমগ্র বিন্যাসে। তুলনায় 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ ব্যবহৃত সিসিফাসের পুরাণকথা এক বহিরঙ্গের চিত্রকল্প হিসেবেই কিন্তু রয়ে গেছে। 'আউটসাইডার' প্রেমেও বিশ্বাস করে না, খুনেও বিশ্বাস করে না। মনোজগতের সমগ্র কাঠামো এক অ্যাবসার্ড পরিসর মেলে ধরে, যার সূচিমুখ দয়াহীন ধ্বংসলীলার দিকে ধাবিত। এমন নির্দয় ও মেদহীন অভিমুখ 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ নেই। নাট্যভিনেতা তীর্থঙ্কর চন্দ যথার্থই লিখেছেন—

> ''... ইন্দ্রজিৎ নাটকে নিশ্চিতভাবে আশার সঙ্কেত আছে কারণ ওতে তীর্থের

পথ দিয়ে আগে এগোবার কথা আছে। তীর্থের পথ মঙ্গলময় হওয়া জরুরি। এভাবেই বাদলবাবুর নাটকে আমরা আশার সংকেত সব জায়গায় পেয়েছি, মরণকে বরণ নয়।"[২৬১]

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত মানুষ বাদল, অভিনেতা বাদল, নাটককার বাদল, কর্মী বাদল মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন— 'ভোমাদে'র উঠোনে। নিজেকে অতিক্রম করবার এমন দুর্যোগপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে খুব কম মধ্যবিত্তই পারে। বাদল সরকার নিজস্ব স্বর উচ্চারণে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রথাগত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সীমাবদ্ধ বৃত্ত। বাদল সরকার ও তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য তার নিজস্ব স্বর মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রথাভাঙা নাট্য উচ্চারণে। তাই বাদল সরকারের নাটক অস্তিত্ববাদী চেতনায় আক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আসলে বাদল সরকার ও তাঁর নাটকের অবমূল্যায়ন করা। একজন সম্পূর্ণ সমাজ সচেতন মানুষ ছিলেন বাদল সরকার। সেইভাবেই নাটক রচনায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাতে কখনো কখনো তাঁকে 'মরবিড' নাটককার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে তিনি মনোবেদনাও পেয়েছেন। কিন্তু থেমে যাননি। কাজ করে গেছেন। নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে যাননি। বাদল সরকারের বহু নাটক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে ভারতের নানা ভাষায়। ভারতবর্ষের বাইরেও তাঁর নাটক নিয়ে, তাঁর নাট্য নির্মাণ নিয়ে চর্চা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হয়ে উঠেছেন সর্বভারতীয় নাট্যজগতের একজন।

তথ্যসূত্র:

১. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ৯৯

২. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, বলরাম বোস ঘাট রোড, কলকাতা-৩২, পৃ. ২৫

৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারি গল্প: আদিপর্ব' ঋতদীপ, ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ১০-১১

৪. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৮

৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'কবিকাহিনী' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৫০

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৫৩

৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'কবিকাহিনী' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৫০

৮. তদেব : পৃ. ৪৫০

৯. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, ৬৮ ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৪৯

১০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সলিউশন এক্স, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৬।

১১. তদেব : পৃ. ২৮

১২. তদেব : পৃ. ৫

১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নাট্যপত্র স্যাস, সংকলন ১৬, ১৯৯৯, ৬৮ ফিয়ার্স লেন, কল-৭৩, পৃ. ২৪৯

১৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'বড় পিসীমা' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪০

১৫. তদেব : পৃ. ৪০

১৬. তদেব : পৃ. ৪১

১৭. তদেব : পৃ. ৪৫

১৮. তদেব : পৃ. ৪৫

১৯. তদেব : পৃ. ৪৫-৪৬

২০. তদেব : পৃ. ৫১

২১. তদেব : পৃ. ৭৫

২২. তদেব : পৃ. ৮৯

২৩. তদেব : পৃ. ৮৯

২৪. তদেব : পৃ. ১০৩

২৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, এখানে সেটি অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭০

২৬. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'বড়োপিসীমা' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৪

২৭. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারি গল্প: আদিপর্ব' ঋতদীপ, ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ২৪

২৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'শনিবার' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ১১৫

২৯. তদেব : পৃ. ১১৫

৩০. তদেব : পৃ. ১২৩

৩১. তদেব : পৃ. ১২৩

৩২. তদেব : 'রাম শ্যাম যদু' নাটকের 'মুখবন্ধ', পৃ. ১৩৪

৩৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রতিভা অগ্রবালের 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য

ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭১

৩৪. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৯৩

৩৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'বল্লভপুরের রূপকথা' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩৬১

৩৬. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩০

৩৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'কবিকাহিনী ' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৫০১

৩৮. তদেব : পৃ. ৪৯১

৩৯. তদেব : পৃ. ৫০২-৫০৩

৪০. অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩১

৪১. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'কবিকাহিনী ' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫০

৪২. তদেব : পৃ. ৪৫০

৪৩. তদেব : পৃ. ৪৯৯

৪৪. তদেব : পৃ. ৪৫০

৪৫. তদেব : পৃ. ৪৬৮

৪৬. তদেব : পৃ. ৪৬২

৪৭. অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, 'বিষয় নাট্যসৃজন : নির্মাতার মুখোমুখি' বাদল সরকার, পৃ. ২১৯

৪৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'কবিকাহিনী' নাটকের মুখবন্ধ অংশ থেকে উদ্বৃত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, কলকাতা-৪৭, মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫০

৪৯. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯

৫০. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২২

৫১. তদেব : পৃ. ৩৩

৫২. তদেব : পৃ. ৫১

৫৩. তদেব : পৃ. ২২৩

৫৪. তদেব : পৃ. ২৪৩

৫৫. মজুমদার, স্বপন : সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫৮

৫৬. তদেব : পৃ. ৬১-৬২

৫৭. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৫

৫৮. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ. ১০৬-১০৭

৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৭৭

৬০. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, 'প্রকাশকের বক্তব্য' অংশ থেকে উদ্ধৃত

৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৭৮

৬২. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯

৬৩. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ১৫

৬৪. তদেব : পৃ. ১৫

৬৫. তদেব : পৃ. ৩-৪

৬৬. তদেব : পৃ. ২১

৬৭. তদেব : পৃ. ৩৭

৬৮. তদেব : পৃ. ৫

৬৯. তদেব : পৃ. ৭-৯

৭০. তদেব : পৃ. ৬৩

৭১. তদেব : পৃ. ৬৩

৭২. তদেব : পৃ. ৬৩

৭৩. তদেব : পৃ. ৮১

৭৪. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৩১

৭৫. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৬৫

৭৬. তদেব : পৃ. ৮২

৭৭. তদেব : পৃ. ১৬

৭৮. তদেব : পৃ. ১৭

৭৯. তদেব : পৃ. ১৭

৮০. তদেব : পৃ. ১৭

৮১. তদেব : পৃ. ১৭

৮২. তদেব : পৃ. ১৮

৮৩. তদেব : পৃ. ২৫

৮৪. তদেব : পৃ. ৭০

৮৫. তদেব : পৃ. ৬৬

৮৬. রায়, অমর চন্দ্র : বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের ইন্দ্রজিৎ: তীর্থপথের চিরপথিক’ শীর্ষক প্রবন্ধ, মদমোহন বেরা, এবং মহুয়া, ফেব্রুয়ারি, ২০২০, ২২তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, পৃ. ৬৪

৮৭. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ২৬

৮৮. তদেব : পৃ. ২৮

৮৯. তদেব : পৃ. ৮০-৮১

৯০. তদেব : পৃ. ৮০

৯১. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৩৯

৯২. তদেব : পৃ. ৩৯

৯৩. তদেব : পৃ. ৩৯

৯৪. তদেব : পৃ. ৩৯

৯৫. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ১৪

৯৬. তদেব : পৃ. ১৪

৯৭. তদেব : পৃ. ৩২

৯৮. তদেব : পৃ. ৩৩

৯৯. তদেব : পৃ. ৩৭

১০০. তদেব : পৃ. ৪৫

১০১. তদেব : পৃ. ৪৭

১০২. তদেব : পৃ. ৫৫

১০৩. তদেব : পৃ. ৫৬

১০৪. তদেব : পৃ. ৬০

১০৫. তদেব : পৃ. ৬২

১০৬. তদেব : পৃ. ৬৯

১০৭. তদেব : পৃ. ৬৯

১০৮. তদেব : পৃ. ৮১

১০৯. তদেব : পৃ. ৮১

১১০. তদেব : পৃ. ৭৫

১১১. তদেব : পৃ. ৮২

১১২. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৬৬

১১৩. তদেব : পৃ. ১৮২

১১৪. তদেব : পৃ. ১৭৩-১৭৪

১১৫. তদেব : পৃ. ১৭৪

১১৬. তদেব : পৃ. ১৭৯-১৮০

১১৭. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩১

১১৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সারারাত্তির, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩১৯

১১৯. দাশ, জীবনানন্দ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বোধ, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ১৯

১২০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সারারাত্তির, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩২৩

১২১. তদেব : পৃ. ৩২৪

১২২. তদেব : পৃ. ৩২৪

১২৩. তদেব : পৃ. ৩২৮

১২৪. তদেব : পৃ. ৩২৮

১২৫. তদেব : পৃ. ৩৪৮

১২৬. তদেব : পৃ. ৩৪৯

১২৭. তদেব : পৃ. ৩৫৬

১২৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৫১

১২৯. তদেব : পৃ. ৫২

১৩০. তদেব : পৃ. ৫২

১৩১. তদেব : পৃ. ৫৫

১৩২. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮০

১৩৩. তদেব : পৃ. ৮০

১৩৪. তদেব : পৃ. ৭৬

১৩৫. তদেব : পৃ. ৮৫

১৩৬. তদেব : পৃ. ৮৫

১৩৭. জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২০

১৩৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮৮

১৩৯. তদেব : পৃ. ৮৮

১৪০. তদেব : পৃ. ৯৩

১৪১. তদেব : পৃ. ৯৩

১৪২. তদেব : পৃ. ৯৪

১৪৩. তদেব : পৃ. ৮৮

১৪৪. তদেব : পৃ. ৯৩

১৪৫. তদেব : পৃ. ৮৯

১৪৬. তদেব : পৃ. ৮৮

১৪৭. তদেব : পৃ. ৮৮

১৪৮. জীবনানন্দ দাশের 'আটবছর আগের একদিন': ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৭১

১৪৯. তদেব

১৫০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৯৪

১৫১. তদেব : পৃ. ৯৪

১৫২. তদেব : পৃ. ৯৬

১৫৩.বসু, সৌমিত্র : বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৯৫

১৫৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'যদি আর একবার' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ১৭৬

১৫৫. তদেব : পৃ. ২০৪

১৫৬. তদেব : পৃ. ২০২

১৫৭. তদেব : পৃ. ২০৩

১৫৮. তদেব : পৃ. ২০৬

১৫৯. তদেব : পৃ. ২০৭

১৬০. তদেব : পৃ. ২১৩

১৬১. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, পৃ. ৭৪

১৬২. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২৭৪

১৬৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা' ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৯৮-৯৯

১৬৪. সরকার, বাদল : এবং ইন্দ্রজিৎ, নবম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০২, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, 'প্রকাশকের বক্তব্য' অংশ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৪

১৬৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বাকি ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৮৮

১৬৬. তদেব : পৃ. ৯৭

১৬৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'ত্রিংশ শতাব্দী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ২৯৯

১৬৮. তদেব : পৃ. ২৯৯

১৬৯. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ‘পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা’ ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৯৭

১৭০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ২৯৯

১৭১. তদেব : পৃ. ৩০৭

১৭২. তদেব : পৃ. ৩০৮

১৭৩. তদেব : পৃ. ৩১২

১৭৪. তদেব : পৃ. ৩০০

১৭৫. তদেব : পৃ. ৩৩৪

১৭৬. তদেব : পৃ. ২৯৯

১৭৭. তদেব : পৃ. ২৯৯

১৭৮. সরকার, বাদল : নানামুখ, প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৮৮, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, পৃ. ৭২

১৭৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩০৩

১৮০. তদেব : পৃ. ৩০৩

১৮১. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ৯০০ পূর্বাঞ্চল, মেন রোড, কলকাতা-৭৮, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২৮৮

১৮২. তদেব : পৃ. ২৮৯

১৮৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘পাগলা ঘোড়া’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৩৮৩

১৮৪. তদেব : পৃ. ৪২৩

১৮৫. তদেব : পৃ. ৩৮৭

১৮৬. তদেব : পৃ. ৪২৮

১৮৭. তদেব : পৃ. ৪১১

১৮৮. তদেব : পৃ. ৪১১

১৮৯. তদেব : পৃ. ৪১০

১৯০. তদেব : পৃ. ৪১৮

১৯১. তদেব : পৃ. ৪৩৬

১৯২. তদেব : পৃ. ৪৩৬

১৯৩. তদেব : পৃ. ৪৩৮

১৯৪. তদেব : পৃ. ৪৩৮

১৯৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, এখানে সেটি অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৮৫

১৯৬. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'পাগলা ঘোড়া', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৩৬

১৯৭. অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০, 'বিষয় নাট্যসৃজন : নির্মাতার মুখোমুখি' কুমার রায়, পৃ. ২৩১

১৯৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'সার্কাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৪০

১৯৯. সরকার, বাদল : নাট্য সংগ্রহ, 'শেষ নেই' নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৪, পৃ. ২০৩

২০০. তদেব : পৃ. ২০৪

২০১. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'সার্কাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ

দে স্ট্রীট, কলকাতা-৪৭, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪

২০২. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৮৬

২০৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'আবু হোসেন', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬২

২০৪. তদেব : পৃ. ৭৮

২০৫. তদেব : পৃ. ৮৮

২০৬. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটককার বাদল সরকার' প্রবন্ধে প্রতিভা অগ্রবাল শিবকুমার যোশীর মন্তব্য ব্যবহার করেছেন, বাদল সরকারের মন্তব্যটি ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটি অপরিবর্তিত রেখে তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৮৯

২০৭. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, বলরাম বোস ঘাট রোড, কলকাতা-৩২, পৃ. ২৯

২০৮. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৯০, পৃ. ৫৫

২০৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'স্পাটাকুস' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১২২

২১০. বাদল সরকারের সঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার: বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ. ১১০

২১১. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি ২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪২-৪৩

২১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৬

২১৩. বাদল সরকার-এর সাক্ষাৎকার: দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৪২

২১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৩

২১৫. তদেব : পৃ. ১২৩

২১৬. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, দেবাশিস চক্রবর্তীর 'প্রসঙ্গ বাদল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১৬

২১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৮০

২১৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'মিছিল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২১০-২১১

২১৯. তদেব : পৃ. ২১১

২২০. তদেব : পৃ. ২১৯

২২১. তদেব : পৃ. ২৩৯

২২২. তদেব : মিছিল নাটকের মুখবন্ধ, পৃ. ২০৮

২২৩. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক' শীর্ষক প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৭২

২২৪. কাবেরী বসু : 'নাটককার বাদল সরকার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে 'ভোমা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও

সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৮৭

২২৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৪৬-৪৭

২২৬. তদেব : পৃ. ২৫২

২২৭. তদেব : পৃ. ২৫৩

২২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১২৭-২৮

২২৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৯৪

২৩০. তদেব : 'ভোমা' নাটক, পৃ. ৩২১

২৩১. তদেব : পৃ. ৩০১

২৩২. তদেব : 'ভোমা' নাটকের মুখবন্ধ, পৃ. ২৯৪

২৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২০৩-২০৪

২৩৪. অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৫৯

২৩৫. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩১

২৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৩৫-৩৬

২৩৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'

নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩৭

২৩৮. তদেব : পৃ. ৩৩৭

২৩৯. তদেব : পৃ. ৩৫২

২৪০. তদেব : পৃ. ৩৫৩

২৪১. তদেব : পৃ. ৩৫৯

২৪২. তদেব : পৃ. ৩৫৯

২৪৩. তদেব : পৃ. ৩৭২

২৪৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'হট্টমালার ওপারে' নাটকের মুখবন্ধ অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৭৬

২৪৫. তদেব : পৃ. ৪০৪

২৪৬. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ৩১ জানুয়ারি ২০১২, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৭১

২৪৭. তদেব : পৃ. ৭৪

২৪৮. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'বাসি খবর' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৯, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৭২

২৪৯. তদেব : পৃ. ৪৯৫

২৫০. তদেব : পৃ. ৫০৩

২৫১. তদেব : পৃ. ৫০৫-৫০৬

২৫২. তদেব : পৃ. ৫০৪

২৫৩. তদেব : পৃ. ৫০৭-৫০৮

২৫৪. তদেব : পৃ. ৫১০

২৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা

২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৭৮

২৫৬. সরকার, বাদল : বাদল সরকারের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'পাখিরা উড়ে যায়' ঋতদীপ ঘোষ সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ডি ডি ১৮/১১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, পৃ. ৮০

২৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা ২০১৭, থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২২৭

২৫৮. তদেব : পৃ. ২২৪

২৫৯. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দের 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়...' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৫৮

২৬০. চৌধুরী, দর্শন : নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ২০৭

২৬১. ভাদুড়ী, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দের 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়...' শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি-১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৪৮